বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ অন্ধকার যুগে কা'বা গৃহে ছাদ ছিল না; শুধু কেবল চারি দিকের দেওয়াল ছিল। উপরোল্লিখিত নির্মাণে কোরায়শগণ ছাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিল। জিদ্দা বন্দরে দুর্ঘটনায় একটি নৌযান ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কোরায়শগণ উহার কাষ্ঠ ক্রয় করিয়া কা'বা গৃহের ছাদ নির্মাণ করিয়াছিল। তখন কা'বা শরীফ পূর্ণাঙ্গ গৃহরূপ হইয়াছিল, কিন্তু উহাকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দিকের জায়গা, যাহা হরম শরীফের মসজিদ, তাহা উন্মুক্তই ছিল।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগেও হরম শরীফ উন্মুক্তই ছিল, এমনকি উহার চতুর্দিকের দেওয়ালও ছিল না; বাড়ী-ঘরের আবেষ্টনেই আবদ্ধ ছিল।

১৬৭২। হাদীছ ঃ হাম্মাদ (রঃ) এবং ওবায়দুল্লাহ (রঃ) বিশিষ্ট তাবেয়ীদ্বয় বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আমলে বাতুল্লাহ শরীফের চতুর্দিকে (মসজিদে হরমের) কোন দেওয়াল ছিল না। (শুধু বাড়ী-ঘরে আবেষ্টিত ছিল এবং) ঐ চতুষ্পার্শ্বস্থ জায়গায়ই নামায পড়া হইত। খলীফা ওমর (রাঃ)-এর আমলে (মসজিদে হরমের) চতুর্দিকে দেওয়াল তৈয়ার হয়, কিন্তু তাহা অনুচ্চ ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) (মসজিদে হরমকে) অধিক প্রশস্ত পূর্ণাঙ্গ গৃহরূপে তৈয়ার করিয়াছিলেন। (পৃষ্ঠা–৫৪০)

সময় নিকটবর্তী ঃ মাটির জগতে মাটির মানুষের নিকট পয়গম্বরী দায়িত্ব পৌঁছাইবেন নবীজী (সঃ)– সেই উদ্দেশেই তাঁহার আবির্ভাব এই জগতে। সেই দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার সময় ঘনাইয়া আসিতেছে, সমুদয় প্রস্তুতি ও যোগাড়-আয়োজন সম্পন্ন হইয়াছে। সেই নির্ধারিত সময়ের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে নবীজীর জীবন, আর মাত্র দুই বৎসর বাকী– নবীজী মোস্তফার (সঃ) বয়স এখন আটত্রিশ বৎসর।

মাটির দেহে আবেষ্টিত নবীজীর উপর পয়গম্বরী সূর্যের উদয়ন-পূর্ব আলোক-রশ্মির বিচ্ছুরণ আরম্ভ হইল। হঠাৎ হঠাৎ তাঁহার নেত্রগোচরে স্বর্গীয় আলোর কিরণমালা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে– তিনি অপূর্ব জ্যোতি দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার পয়গম্বরীর সাক্ষ্য-সম্মান পাহাড়-পর্বত বৃক্ষ-লতার প্রাকৃতিক কণ্ঠ হইতে শ্রবণ করিয়া থাকিতেন। এক এক সময় স্পষ্ট শুনিতে পাইতেন, السلام عليك يارسول الله "আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ– আপনার প্রতি সালাম হে আল্লাহর রসূল।" এই সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি কৌতূহল ও বিস্ময়ে চতুর্দিকে তাকাইতেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খোঁজ করিতেন– ইহা কাহার কণ্ঠ, কাহার সাক্ষ্য, ইহা কাহার সালাম? কিন্তু পর্বতমালার পাথর ও বৃক্ষরাজি ছাড়া তথায় তিনি কিছুই দেখিতে পাইতেন না। (যোরকানী–১–২১৯)

পয়গম্বরী প্রাপ্তির পরেও তাঁহার এই অবস্থা চলমান ছিল। পয়গম্বরী প্রাপ্তির সূচনায় প্রথমবার তিনি 'ওহী' লাভ করিয়াছিলেন, তারপর দীর্ঘ দিন তাহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকিল (যাহার বিবরণ সম্মুখে আসিবে)। তারপরেও হয়ত কিছু দিন ওহীর আগমন অপেক্ষাকৃত শিথিল ছিল– এই সময়েও তিনি ঐ আলোকরশ্মির প্রতিভাত হওয়ার বিষয় অবলোকন করিয়া থাকিতেন এবং অদৃশ্য স্বর তাঁহার শ্রবণে আসিত। পয়গম্বরী প্রাপ্তির দুই বৎসর পূর্ব হইতে সাত বৎসর পর্যন্ত নবীজীর এই অবস্থা চলিয়াছিল। মুসলিম শরীফের হাদীছে আছে يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولايرى شيئا "অদৃশ্য কণ্ঠের স্বর তিনি শুনিতেন, কিন্তু কিছু দেখিতেন না এবং আলোকরশ্মির বিচ্ছুরণ তিনি অবলোকন করিতেন– এই অবস্থা দীর্ঘ সাত বৎসর বিরাজমান ছিল।

মুসলিম শরীফের আর এক হাদীছে বর্ণিত আছে–

انی لاعرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل ان ابعث انى لاعرفه الان ـ

অর্থ ঃ "মক্কার একটি পাথর আমি চিনি– ঐ পাথরটি আমাকে সালাম করিয়া থাকিত আমার পয়গম্বরী প্রাপ্তির পূর্বে; এখনও ঐ পাথরটি আমার স্মরণে রহিয়াছে।"

তিরমিযী শরীফের এক হাদীছে আছে– আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কায় থাকাকালে একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে এক দিকে যাইতেছিলাম। যত পাহাড় বৃক্ষ নবীজীর (সঃ) সম্মুখে পড়িতেছিল প্রত্যেকটি তাঁহাকে السلام عليك يارسول الله "আপনার প্রতি সালাম হে রসূলুল্লাহ!" এই বলিয়া সম্ভাষণ জানাইতেছিল।

আর মাত্র ছয় মাস বাকী– নবীজীর বয়স চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইয়া নবুয়তপ্রাপ্তির দ্বারে পৌঁছিতেছে, এই সময় উর্ধ্বজগতের আর এক আলিঙ্গন নবীজী (সঃ)-কে অভিভূত করিল। নবীজী (সঃ) যাহা কিছু স্বপ্নে দেখেন প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের আলোর ন্যায় তাহার বাস্তবতা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

স্বাভাবিকভাবে নবীজী মোস্তফা (সঃ) অতিশয় চিন্তাশীল ভাবগম্ভীর স্বভাবের ছিলেন। হাদীছ শরীফে আছে– كان النبى صلى الله عليه وسلم دائم الفكرة متواصل الاحزان

অর্থ ঃ "নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সদা চিন্তামগ্নও ভাবগাম্ভীর্যে নিমজ্জমান থাকিতেন।"

উল্লিখিত অসাধারণ অবস্থাসমূহ এবং অতিন্দ্রিয় লোকের হাতছানি তাঁহার ঐ স্বভাবকে তীব্রতর করিয়া তুলিল। ভাবের আবেশ তাঁহার ভিতরে-বাহিরে আরও সুগভীর হইয়া উঠিল। এখন তিনি নির্জন নিরিবিলি স্তব্ধ পরিবেশে থাকার প্রতি অতিশয় ঝুঁকিয়া পড়িলেন। জনহীন শব্দহীন লুক্কায়িত স্থানে সর্বেন্দ্রিয় আবদ্ধ অবস্থায় একাগ্র চিত্তে মন ও ধ্যানকে এক প্রভু এক পরওয়ারদেগার এক সৃষ্টিকর্তার প্রতি রুজু রাখিতে ভালবাসিতে লাগিলেন। লোকালয়ের এবং সংসারের কর্মকোলাহল তাঁহার আধ্যাত্মিক চেতনা দুর্বল করিয়া দেয় না কি? সমাজ-জীবনের পঙ্কিলতা তাঁহার প্রতি ধাবমান নূর জ্যোতির স্রোতকে বাধাগ্রস্ত করে না কি?– তিনি যেন এই শঙ্কা, এই ভীতি, এই ভাবনায় অস্বস্তি উদ্বেগ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাই নিভৃত নিস্তব্ধ স্থানে জনবসতি হইতে দূরে সরিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকা তাঁহার নিকট প্রিয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

তিনি গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন, এমনকি রাত্রেও বাড়ী ফিরিতেন না, কোন পর্বত গুহায় থাকিয়া যাইতেন। অনেক সময় এরূপ হইত যে, বিবি খাদীজা (রাঃ) তাঁহাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া রুটি-পানি পৌঁছাইয়া আসিতেন। (আসাহহুস সিয়ার–৫৮)

ধীরে ধীরে তাঁহার ধ্যান-চিন্তায় শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিলেও নিরালা-নির্জন বাসের স্পৃহা তাঁহার বাড়িয়াই চলিয়াছে। এখন তিনি মক্কা হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত হেরা পর্বতে দেড় মাইল উচ্চ শৃঙ্গের নিভৃত গুহায় একাধারে কতক দিবারাত্র কাটাইবার নিয়ম বাঁধিয়া নিলেন। বিবি খাদীজা (রাঃ) প্রকৃত সহধর্মিনীর ন্যায় স্বামীর এই কার্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। তিনি দুই চারি দিনের মত খাদ্য-পানীয় প্রস্তুত করিয়া দিতেন, নবীজী (সঃ) তাহা লইয়া সেই নিভৃত সাধনা গুহায় পৌঁছিতেন। সেই খোরাকী ফুরাইয়া গেলে গৃহে আসিয়া পুনরায় খাদ্য-পানীয় লইয়া তথায় ফিরিয়া যাইতেন। এইভাবে নবীজী (সঃ) এক বিরাট পরিবর্তনের দিকে আগাইয়া চলিলেন এবং সেই পরিবর্তনটা যেন ক্রমশই সাফল্যময় পরিণতির দিকে দ্রুত অগ্রসর বলিয়া তাঁহার মনে হইত। অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে চিরবাঞ্ছিতকে পাইবার প্রাক্কালে মানুষের যেরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হয়, নবীজীর উপর যেন সেই ভাব পরিলক্ষিত! তিনি শান্ত শিষ্ট চিত্তে দিবানিশি আল্লাহ তাআলার যিকির-ফিকিরে মগ্ন থাকেন; এইভাবে দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার বয়স চল্লিশ পূর্ণ হইয়াছে; এই সময়ে তাঁহার ভিতরে-বাহিরে কেবল নূর– কেবল জ্যোতি।

সত্যের প্রথম প্রকাশ– নবুয়তের প্রারম্ভ (পৃষ্ঠা–৫৪৩)

রমযান মাস,* অমাবস্যা-পূর্ব অন্ধকার, রজনী গভীর, লোকালয় হইতে বহু দূরে হেরা পর্বতের উচ্চ শৃঙ্গে নিভৃত প্রকোষ্ঠে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ধ্যানমগ্ন। এমন সময় হঠাৎ মহাসত্যের আগমন হইল– ফেরেশতা জিব্রাঈল (আঃ) ঐ প্রকোষ্ঠে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং সালাম করিলেন। ফেরেশতা নূরের তৈয়ারী; বহন করিয়া আনিয়াছেন আল্লাহ তাআলার কালাম– তাহাও নূর; এইসব নূরের আকর্ষণে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জড় দেহের আবেষ্টনে লুক্কায়িত মহানূরও প্রতিভাত হইয়াছে অসাধারণভাবে। অতএব হেরা গুহায় এখন নূর! নূর!! সবই নূর। নবীজী মোস্তফার (সঃ) ভিতর বাহির নূরের জৌলুসে নূরই নূর হইয়া গিয়াছে। এই মহা মুহূর্তে তাঁহার দেহ-মনের অবস্থা একমাত্র তাঁহারই অনুভব করিবার কথা– ব্যক্ত বা বর্ণনা করার আয়ত্ত বহির্ভূত। নিভৃত গিরিগহ্বরের এই অভূতপূর্ব মুহূর্তটি মোস্তফা হৃদয়ে কি রেখাপাত করিয়াছিল তাহা কি কোন মানুষ নির্ণয় করিতে পারে? "ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ।"

সব কিছুই সত্য, কিন্তু ইহাও সত্য যে, এইসব অবস্থার মাঝে নবীজী মোস্তফার (সঃ) জ্ঞান, উপলব্ধি চেতনা সম্পূর্ণ সুষ্ঠু ও প্রখর ছিল, তাহাতে কোনই ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

এই পরিস্থিতি অপেক্ষা লক্ষ-কোটি গুণ অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জ্ঞান-উপলব্ধির কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই; এমনকি চর্মচোখ পর্যন্ত বিন্দুমাত্র ঝলসায় নাই বলিয়া স্বয়ং আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে নবীজীর প্রশংসা করিয়াছেন। মে'রাজ ভ্রমণে নবীজী (সঃ) মহান আরশ-কুরসী, সেদরাতুল মোন্তাহা ইত্যাদিসহ যাহা কিছু পরিদর্শন করিয়াছিলেন সেই সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন, لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى মোস্তফা (সঃ) তাঁহার প্রভু পরওয়ারদেগারের অপেক্ষাকৃত অনেক বড় বড় কুদরতের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সেই অস্বাভাবিক অবস্থার ভিড়ের মধ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অবস্থা বর্ণনায় আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى "ঐসব পরিদর্শনে নবীজীর চোখ মোটেই ঝলসায় নাই এবং কোনপ্রকার ব্যতিক্রমেও পতিত হয় নাই।"

হেরা প্রকোষ্ঠে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল তাহার মাঝে নবীজী মোস্তফা (সঃ) স্বীয় জ্ঞান, উপলব্ধি ও সুষ্ঠু চেতনার মাধ্যমে ফেরেশতা জিব্রাঈলকে সম্যকরূপে চিনিতে ও বুঝিতে পারিয়াছিলেন– ইহাও আল্লাহ তাআলার এক কুদরতই ছিল।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ পরিচয় ও গুণের উল্লেখ রহিয়াছে এই– اَلَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى "আল্লাহ তাআলা সেই মহান যিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে উহার আকৃতি প্রকৃতি দান করিয়াছেন; অতপর তিনিই তাহাকে স্বাভাবিক ধর্মের প্রতি স্বয়ংক্রিয়রূপে পরিচালিত করিয়াছেন। (১৬–১১) আরও আছে–اَلَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى "আল্লাহ তাআলাই (প্রত্যেক সৃষ্টির স্বভাব ও প্রয়োজন) নির্ধারিত করিয়াছেন এবং তাহাকে সেই স্বভাব প্রয়োজনের প্রতি পরিচালিত করিয়াছেন।" যথা– কাহার খাদ্য কি? প্রত্যেক সৃষ্টি শিক্ষা ও পরিচয় করানো ছাড়াই তাহার সহিত পরিচিত হয় এবং নিজ নিজ আহারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সদ্য প্রসূত শিশু কাহারও শিক্ষা দান ছাড়াই মাতার বক্ষ হইতে দুগ্ধ আহরণের কৌশল-প্রণালী

* নবুয়ত ও কোরআন অবতরণ আরম্ভের সময়কাল সম্পর্কে অনেক মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশ সীরাত সঙ্কলকগণের সিদ্ধান্ত এবং বিশিষ্ট ইমামগণের মত ইহাই যে, তাহা রমযান মাসে ছিল। পবিত্র কোরআনের আয়াতও এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে সুস্পষ্ট– যদি তাহাতে কোন প্রকার হেরফের করা না হয়। (যোরকানী ১–২০৭) এই হিসাবে নবুয়তপ্রাপ্তি চল্লিশ বৎসর ছয় মাসেরও বেশ কিছু দিন ঊর্ধ্বের বয়সে ছিল।

বুঝিয়া উঠে; এমনকি পরিচয় প্রদান এবং কাহারও হইতে পরিচয় গ্রহণ ব্যতিরেকেই তাহার অন্তর তাহার সহিত এত গভীরভাবে পরিচিত হয় যে, সেই পরিচয়ের কোন তুলনা হয় না। এই শ্রেণীর হাজার পরিচয় ও উপলব্ধি কোথা হইতে আসে? এই সবের প্রবাহ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার তরফ হইতেই পৌঁছিয়া থাকে। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার এই মহাদানই উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

শিশুর জন্য মায়ের পরিচয় যে প্রয়োজন তাহা মিটাইয়া থাকেন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা; নবীর জন্য জিব্রাঈলের পরিচয় তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজন এবং হেরা গুহার সেই প্রয়োজন সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণরূপে মিটাইয়াছিলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলাই। যোরকানী, ১-২১৮)

ফেরেশতা জিব্রাঈল (আঃ) প্রকাশের পর রসূল হওয়ার সুসংবাদ দানে নবীজীকে অভিনন্দিত করিলেন। সুস্পষ্ট সুসংবাদপ্রাপ্তিতে নবীজী (সঃ) সংশয়মুক্তরূপে রসূল হওয়ার একীন লাভ করিলেন। অতপর জিব্রাঈল (আঃ) নবীজী (সঃ)-কে বলিলেন, পড়ুন; নবীজী (সঃ) বলিলেন, আমি পড়ায় সামর্থ্যবান নহি।

কাহারও মতে ঐ সময় জিব্রাঈল (রাঃ) রেশমীপত্রে নূরানী মণি-মুক্তা খচিত একখানা লিপি নবীজীর হস্তে অর্পণ করিয়া তাই পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন। লেখাপড়া না শেখা ব্যক্তি লিপি পাঠে সক্ষম হয় না- তাহাই নবীজী (সঃ) বলিয়াছিলেন, আমি পড়ায় সামর্থ্যবান নহি। অনেকের মতে জিব্রাঈল (আঃ) মৌখিক পড়ার কথাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু পঠনীয় কোন বস্তু শুধু শুনিয়া আবৃত্তি করাও লেখাপড়া না শেখা ব্যক্তির পক্ষে কঠিন হয়, এতদ্ভিন্ন পূর্বালোচিত ভয়াল দৃশ্যাবলীর চাপে ঐ সময় নবীজীর উপর সৃষ্ট শিহরণ ও কম্পন কোন কিছু পাঠ বা আবৃত্তি করিতে প্রতিবন্ধক হইতেছিল- তাই নবীজী (সঃ) বলিয়াছিলেন, আমি পড়ায় সমর্থ নহি। (সীরাতে মোস্তফা, পৃষ্ঠা-১-১০০)

যাহাই হউক, জিব্রাঈল (আঃ) নবীজীর সাহস ভাঙ্গা দেখিয়া তাঁহার মনোবল বৃদ্ধির উদ্দেশে স্বীয় দৈবশক্তি প্রয়োগে নবীজীর আধ্যাত্মিক শক্তিকে উচ্ছলিত করার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি স্বীয় বক্ষে নিবেশনপূর্বক আলিঙ্গনের মাধ্যমে সজোরে চাপ দিলেন; এমনকি চাপের দরুন নবীজী (সঃ) ক্লেশ অনুভব করিলেন। প্রথমবার আলিঙ্গনে নবীজীর সাহস সতেজ হইল না, তাই পর পর তিনবার আলিঙ্গন করিলেন; তৃতীয় বার আলিঙ্গনের পর জিব্রাঈলের পঠিত পাঁচটি আয়াত নবীজী (সঃ) অনায়াসে পড়িতে পারিলেন।

হেরা গুহার ঘটনায় সব কিছু চেনা, বুঝা ও উপলব্ধি করার মধ্যে নবীজীর বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। কিন্তু এই দুনিয়াতে তিনি মানবীয় মাটির দেহে আবির্ভূত; আত্মা তাঁহার বহু ঊর্ধ্বের, কিন্তু তাঁহার দেহ ও দেহাভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি মাটির জগতের। অতএব তাঁহার দেহের উপর কোন বিশেষ ঘটনার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না- এই দৃষ্টিতে হেরা গুহার ঘটনার কতিপয় খুঁটিনাটি বিষয় লক্ষ্য করুন ঃ

(১) নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশ!
(২) অন্ধকারময় গভীর রজনী!
(৩) লোকালয় হইতে বহু দূরে!
(৪) পর্বত শৃঙ্গের নিভৃত গুহায়!
(৫) পরে পরিচয় হইলেও আগন্তুকের অকস্মাৎ আগমন!

এতগুলি ভীতির কারণ সমাবেশে মানবীয় দেহের উপর সাময়িক শিহরণ কম্পন সৃষ্টি হওয়া কতই না স্বাভাবিক।

সর্বোপরি কথা- নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঘটনার মর্ম সবই বুঝিতে পারিয়াছিলেন; পারিবেন না কেন? তিনি ত পাহাড়-পর্বত বৃক্ষ-লতার সাক্ষ্য শুনিয়া আসিতেছিলেন, انك لرسول الله "নিশ্চয় আপনি মহাপুরুষ, আল্লাহর রসূল"। লুক্কায়িত সাক্ষ্যের আজ চূড়ান্ত বিকাশ, তাই গুরুদায়িত্বের চেতনাও আজ পূর্ণমাত্রায় উপনীত। তাঁহার নিকট যে সত্য আসিয়াছিল, যে কর্তব্য পালনের জন্য তাঁহাকে

প্রস্তুত করা হইয়াছিল তাহা সহজ কাজ নহে। তাঁহাকে মুক্তির পতাকা দিয়া পাঠান হইয়াছিল বিশ্বের বিশাল কর্মক্ষেত্রে। কর্ম ও সাধনা যুগপৎভাবে উভয় লইয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইবে এই বিশাল ধরাপৃষ্ঠে।

এতদ্ভিন্ন আরও একটি ভীষণ চাপের বস্তু ছিল "ওহী"। ফেরেশতা জিব্রাঈল (আঃ) নিজ অবস্থায় থাকিয়া ওহী পৌঁছাইলেন। সেই ওহীর গুরুচাপ সম্পর্কে হাদীছেই উল্লেখ আছে যে, অত্যধিক শীতের সময়ও নবীজী (সঃ) ঘর্মাক্ত হইয়া যাইতেন; ঘর্মের ধারা তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে বহিয়া পড়িত, গলগণ্ড হইতে গোঙ্গানির শব্দ নির্গত হইত, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া যাইত। (প্রথম খণ্ড ২ নং হাদীছ) ওহীর আভ্যন্তরীণ গুরুচাপ সম্পর্কে যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) ছাহাবীর বর্ণনা রহিয়াছে– একদা মাত্র একটি শব্দের ওহী অবতীর্ণ হইল; ঐ সময় আমি নবীজীর পাশে বসা ছিলাম; তাঁহার উরু আমার উরুর উপরে ছিল। ওহীর ভীষণ চাপে আমার উরু চূর্ণ হইয়া যাইবে মনে হইতেছিল। হেরা গুহার ঘটনায় বাহ্যিক চাপ ততটা না হইলেও আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক চাপ ত অবশ্যই ছিল। তদুপরি এক দুই বার নহে, তিন বার জিব্রাঈল ফেরেশতার আলিঙ্গন চাপও ছিল। বিদ্যুৎ স্পর্শের চাপ বাহ্যিকরূপে দৃশ্য না হইলেও আভ্যন্তরীণ চাপ কতই না বিরাট হইয়া থাকে এবং সেই চাপে বিদ্যুৎ শলাকায় কম্পনও সৃষ্টি হইতে পারে। এস্থলে নির্মল জ্যোতির ফেরেশতা জিব্রাঈল চির জ্যোতির্ময় বস্তু "ওহী" নিয়া আসিয়াছেন; তাঁহার স্পর্শে নবীজীর প্রাণে শিহরণ জাগিয়া উঠা মোটেই বিচিত্র ছিল না, বরং এই ক্ষেত্রে শিহরণ সৃষ্টি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। হাদীছে ও ইতিহাসে যদি শিহরণের উল্লেখ না থাকিত তবে তাহা অস্বাভাবিক পরিগণিত হইত।

ভয়াল দৃশ্য, ওহীর চাপ ও ফেরেশতা জিব্রাঈলের আলিঙ্গন ক্রিয়ার সৃষ্ট শিহরণ এবং বিশাল দায়িত্বের গুরুভার বোধে সৃষ্ট শঙ্কা ও ভীতিসহ হেরা গুহায় সর্বপ্রথম অবতারিত اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ পবিত্র কোরআনের পাঁচটি আয়াত লইয়া নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং গৃহের লোকজনসহ খাদীজা (রাঃ)-কে কম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, আমাকে আবৃত কর– আমাকে আবৃত কর। গৃহের সকলে নবীজী (সঃ)-কে কম্বল আবৃত করিয়া নিলেন; ক্ষণিকের মধ্যে তাঁহার শিহরণ কম্পন দূরীভূত হইল। তিনি স্বাভাবিক শান্ত অবস্থায় প্রকৃতিস্থ হইয়া

বলিলেন, হে খাদীজা! অসাধারণ আশ্চর্যজনক অবস্থা আমার উপর অর্পিত হইয়াছে– এই বলিয়া সকল বৃত্তান্ত তিনি খুলিয়া বলিলেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বিবি খাদীজা (রাঃ)-কে আরও বলিলেন, আমার কিন্তু প্রাণের ভয় হয়।

নবীজী (সঃ) স্বীয় দায়িত্ব এবং কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা-চেতনা হেরাগুহা হইতেই নিয়া আসিয়াছিলেন; এখন থাকিয়া থাকিয়া এই কর্তব্যের কঠোরতা বিশেষতঃ কর্মস্থলের ভয়াবহতা তাঁহার চোখে ভাসিয়া উঠিতেছিল। বিশ্বজোড়া আল্লাহ ভোলা মানব শেরেক ও মূর্তিপূজায় পরিবেষ্টিত, আর সেই কাজে সকলের গুরু হইল মক্কাবাসী– সেই মক্কায়ই নবীজীকে প্রথম দাঁড়াইতে হইবে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ধ্বনি লইয়া, আঘাত হানিতে হইবে শেরেক ও মূর্তিপূজার প্রতি। এই পরিস্থিতিতে দেশজোড়া, বিশ্বজোড়া শত্রুর হাতে প্রাণ হারাইবার শঙ্কা ও ভীতি কি অমূলক? কত নবীই ত এই পরিস্থিতিতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। নবীজীর নিকটতম নবী ঈসা (আঃ), ইহুদীদের দ্বারা তাঁহার কি অবস্থা ঘটিয়াছিল, দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরে নবীজী (সঃ) তাহার কোন খোঁজই কি পান নাই?

বিবি খাদীজা (রাঃ) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা ও অভয় দিতে লাগিলেন। তিনি নবীজীর জনসেবামূলক উন্নত চরিত্রের মহিমা ও গুণাবলী উল্লেখপূর্বক দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত বলিলেন, কস্মিনকালেও আল্লাহ আপনার প্রতি বিমুখ হইবেন না। তিনি নিজেই আপনাকে দায়িত্ব কর্তব্য অর্পণ করিয়াছেন; তাহা যথাযথ পালন করিয়া যাওয়ার সুযোগ শক্তি প্রদান না করার অর্থ আপনাকে অপমান করা; আল্লাহ তাআলা আপনাকে অপদস্থ-অপমান নিশ্চয়ই করিবেন না। এই সময়ে বিবি খাদীজা নবীজীর যে কয়টি চারিত্রিক গুণাবলীর উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন– আপনি

স্বজনবর্গের চির শুভাকাঙ্ক্ষী, মঙ্গলকামী বন্ধু, আপনি পরের দুঃখ বহনকারী মহাজন, আপনি গরীব কাঙ্গাল দুঃখীজনের সেবক, যাহার কেহ নাই, কিছু নাই, আপনি তাহার আপনজন এবং সব কিছু। নবুয়তের পূর্ব হইতেই এই প্রেম ও সেবাবৃত্তি হযরতের জীবনের বিশেষত্ব ছিল। এইসব ছিল হযরতের আজন্ম প্রতিপালিত সুন্নত। এরূপ পুণ্যবান মহামতি মহাত্মাকে কি আল্লাহ তাআলা বিপর্যস্ত ও অপদস্থ-অপমান করিবেন? কস্মিনকালেও নহে। এই পরিস্থিতিতে বিবি খাদীজা (রাঃ) উপযুক্ত সহধর্মিনীর দায়িত্বই পালন করিয়াছিলেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই কঠিন মুহূর্তে যেভাবে তিনি তাঁহার জন্য সান্ত্বনা যোগাইয়াছিলেন– তাহা তাঁহার চির সৌভাগ্যের প্রতীক এবং প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ হইয়া থাকিবে; খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার এই মহৎ চরিত্রের তুলনা নাই। বিবি খাদীজা (রাঃ) কিন্তু ধীরস্থির, শান্ত অচঞ্চল; এইরূপ হইবেন না কেন? তিনি ত নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উদীয়মান সূর্যের প্রভাতী আলো পূর্ব হইতে প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন এবং সদা তাকাইয়া ছিলেন সেই সূর্য দৃষ্ট হওয়ার শুভলগ্নের প্রতি। সেই চির আকাঙ্ক্ষিত সূর্য আজ উঁকি দিয়াছে; মনে কি আনন্দের ঠাঁই হয়? প্রাণে কি উল্লাসের সঙ্কুলান হয় বিবি খাদীজার? "রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা।"

বিবি খাদীজার চাচা সম্পর্কীয় মুরব্বী জ্ঞানবৃদ্ধ তাপস সৎ-সাধু ওয়ারাকা ইবনে নওফল– যাঁহার সহিত খাদীজা (রাঃ) পূর্ব হইতেই নবীজী (সঃ) সম্পর্কে যোগাযোগ রাখিয়াছিলেন, দাম্পত্য প্রণয়নে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন; ঐ সময় তাঁহার নিকট মায়সারার বর্ণিত ঘটনা ইত্যাদি বর্ণনা করিলে এই ওয়ারাকাই নবীজীর উজ্জ্বল ভবিষ্যত এবং নবী হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া খাদীজা (রাঃ)-কে বিবাহের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। বিবি খাদীজা (রাঃ) সেই আশায় বুক বাঁধিয়াই অসময়ে বিবাহে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আজ যখন সেই আশার সূর্যোদয়ের সুস্পষ্ট ঘটনাবলীর খোঁজ পাইলেন এবং সেই ঘটনাবলীর নিদর্শন চোখে দেখিলেন তখন কি আর খাদীজা (রাঃ) এই মুহূর্তেই ওয়ারাকার নিকট না যাইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন? স্বাভাবিকভাবেই বিবি খাদীজা (রাঃ) এই নূতন ঘটনাবলীর বর্ণনা ওয়ারাকাকে শুনাইয়া তাঁহার পূর্ব ধারণার বাস্তবতা জ্ঞাত করিতে এবং নিজের আকাঙ্ক্ষিত সৌভাগ্য ও গৌরবের উদয় খবর প্রদানে ব্যাগ্র হইয়া পড়িলেন। অন্যের মুখে ও সাক্ষ্যে নহে, বরং স্বয়ং যাঁহার ঘটনা তাঁহার মুখেই ওয়ারাকাকে বিস্তারিত শুনাইবার আগ্রহে বিবি খাদীজা (রাঃ) নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাহকেও সঙ্গে লইলেন। বিবি খাদীজার ন্যায় সর্বোৎসর্গকারিণী জীবনসঙ্গিনীর আগ্রহ -আকাঙ্ক্ষা নবীজী (সঃ) কি উপেক্ষা করিবেন? তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য নবীজী (সঃ) সঙ্গে গেলেন। নবীজী (সঃ) নিজের ঘটনা সম্পর্কে ওরাকার সিদ্ধান্ত শুনিয়া কোন সংশয় দূর করার জন্য নিজ আগ্রহে ওয়ারাকার নিকট গিয়াছিলেন– এইরূপ বিবৃতি কোন ইতিহাসেও নাই, হাদীছেও নাই; শত্রুরা প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডারূপে এই শ্রেণীর কথা গড়িয়া থাকে।

আসমানী কিতাবের অভিজ্ঞ সৎ-সাধু ওয়ারাকা সকল বৃত্তান্ত শ্রবণে সেই মুহূর্তেই সত্য ধরিয়া ফেলিলেন এবং অকাতরে তাহার স্বীকৃতিদানে দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত বলিলেন, এই ত সেই চির মঙ্গলময় বার্তাবাহক দূত ফেরেশতা যিনি মূসা ও ঈসা পয়গম্বরদ্বয়ের নিকট আল্লাহর বাণী ওহী বহন করিয়া আনিতেন। নবীজী (সঃ)-এর পয়গম্বরী প্রসার লাভের সময় পর্যন্ত জীবিত থকার আকাঙ্ক্ষাও তিনি প্রকাশ করিলেন। আসমানী কিতাবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনি দেশময় নবীজীর (সঃ) শত্রুতা সৃষ্টির সংবাদ দানে বলিলেন, মক্কাবাসীরা আপনাকে দেশত্যাগে বাধ্য করিবে; নবীজী (সঃ) স্তম্ভিত স্বরে বলিলেন, মক্কাবাসীরা আমাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবে! ওয়ারাকা বলিলেন, হাঁ– আপনার শ্রেণীর প্রত্যেকের সহিতই এইরূপ শত্রুতা করা হইয়াছে। ওয়ারাকা ইহাও বলিলেন, ঐ সময় যদি জীবিত থাকি তবে আমার শক্তি সাধ্যের সর্বশেষ বিন্দু ব্যয়ে আপনার সাহায্য-সহায়তা করিয়া যাইব। সেই মুহূর্তে ওরাকার ন্যায় ব্যক্তির এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয়ের স্বীকৃতি পাইয়া বিবি খাদীজা (রাঃ) নিজ বিশ্বাস ও সৌভাগ্যের গৌরবে কিরূপ পুলকিত হইয়াছিলেন তাহা অনুভব উপলব্ধি করার বস্তু; ব্যক্ত করার নহে।

ওয়ারাকা বিবি খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নিকট চির স্মরণীয় হইয়া থাকিলেন। তিনি কি

তাঁহাকে ভুলিতে পারেন? নবীজীর (সঃ) চরণতলে ছায়ালাভে তিনিই প্রথম উৎসাহ যোগাইয়াছিলেন এবং আকাঙ্ক্ষিত সৌভাগ্যের উদয় মুহূর্তেও তিনি সত্যের সঠিক স্বীকৃতি ও উপযুক্ত মূল্যদানে বিবি খাদীজার অন্তরকে গৌরবে আনন্দে ভরিয়া দিলেন। ওয়ারাকার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না; অল্প দিনের মধ্যে তিনি ইন্তেকাল করিয়া গেলেন– নবীজীর পয়গম্বরীর প্রসারকাল তিনি পাইলেন না। একদা খাদীজা (রাঃ) নবী (সঃ)-কে বলিলেন, ওয়ারাকা ত আপনার পয়গম্বরীতে পূর্ণ বিশ্বাস ও স্বীকৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। নবী (সঃ) বলিলেন, আমি ওয়ারাকাকে স্বপ্নে সাদা পোশাকে দেখিয়াছি; সে নরকী হইলে (আমার স্বপ্নে) তাহার এই পোশাক হইত না। আরও বর্ণিত আছে– নবী (সঃ) বলিয়াছেন, ওয়ারাকাকে মন্দ বলিও না; আমি বেহেশতে তাহার জন্য তৈয়ারি বাগান দেখিয়াছি। (সীরাতে মোস্তফা, ১–১০৭)।

সর্বপ্রথম ওহী

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۔ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۔ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۔ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۔ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ۔

অর্থ ঃ "তোমার প্রভু পরওয়ারদেগারের নামের সাহায্য লইয়া পড়– যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন রক্তপিণ্ড হইতে। পড়; তোমার প্রভু-পরওয়ারদেগার মহামহিম। তিনি জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন কলমের দ্বারা। তিনি মানুষকে অজ্ঞাতপূর্ব জ্ঞান দান করিয়াছেন।"

যেই মহাসত্যের প্রতীক্ষায় ছিল সারা জাহান; যুগ-যুগান্তর হইতে ধরণীপৃষ্ঠে কত নবী-রসূল আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুত শুনাইয়া গিয়াছেন সেই মহাবাণী সম্পর্কে। সেই মহাসত্য বাণীই হইল আল্লাহর পাক কালাম; আজ তাহার প্রথম অবতরণ। তাহার প্রথম প্রকাশ কত সুন্দর! মানুষের ধ্যান-ধারণায় বিপ্লব সৃষ্টি করিতে কত সুগভীর ক্রিয়াশীল!

মানুষ সৃষ্টিগতভাবে অন্যের মুখাপেক্ষী ও প্রত্যাশী, অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল অক্ষম। আল্লাহ ভোলা মানুষ তাহার মুখাপেক্ষিতা অক্ষমতা দূরীকরণে সৃষ্টিকর্তাকে ছাড়িয়া শত দুয়ারে ছুটাছুটি করে– ইহা হইতেই আল্লাহ ভিন্ন অন্যের পূজার সূচনা হইয়াছে; যাহার উচ্ছেদের জন্য ইসলামের আবির্ভাব, কোরআনের অবতরণ। তাই কোরআনের সর্বপ্রথম শিক্ষা– যেকোন প্রত্যাশা পূরণে এবং শক্তি সামর্থ্যের কামনায় প্রত্যেকে আল্লাহর প্রতি ধাবিত হইবে। প্রথম আয়াতের মর্ম ও মূল তাৎপর্য ইহাই; নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে সম্বোধন করা এবং পড়ার উল্লেখ করা আয়াতটির অবতরণ ক্ষেত্রের সামঞ্জস্যে উদাহরণ মাত্র। উদ্দেশ এই যে, প্রত্যেকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রত্যেক কার্যে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার সাহায্য কামনা করিবে। তাহা করিলে শক্তি-সাহসের অভাব থাকিলেও সাফল্য লাভ হইবে। আল্লাহ অতি মহান, অতি মহান– ইহজগতে বান্দা আল্লাহর সাহায্য চাহিবার জন্য আল্লাহকে পাইবে কোথায়? এই জটিলতার সহজ সমাধানেই বলা হইয়াছে, আল্লাহর নামে সাহায্য সম্বল করিয়া কার্যে অবতীর্ণ হইয়া পড়; এতটুকুই তোমার জন্য যথেষ্ট হইবে।

বিশ্বজোড়া ভুল ধ্যান-ধারণা, আল্লাহর দুয়ার ছাড়িয়া অন্যের দুয়ারে যাওয়া, ইহার আমূল পরিবর্তন পূর্বক সাহায্য-সহায়তার প্রত্যাশী একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকট প্রত্যাশী হওয়ার আদর্শ ও নীতি শিক্ষা দেওয়াই প্রথম আয়াতের মূল তাৎপর্য। এই আদর্শ ও নীতি হইতে বিচ্যুত হওয়াই তওহীদের বিপরীত শেরকের সূত্র; তাই সর্বপ্রথম ওহী এই আদর্শ ও নীতি প্রবর্তনের অতি সুন্দর প্রারম্ভই বটে।

সঙ্গে সঙ্গে সেই নীতির যৌক্তিকতায় আল্লাহ তাআলা স্বীয় পরিচয় দানে বলিতেছেন, তিনিই বিশ্ব-নিখিলের "রব" তথা সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা– সকল সৃষ্টিকে তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি সম্পর্কে কত না গর্হিত মতবাদ ছিল– সেসব মতবাদ মানুষকে আল্লাহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শেরকে লিপ্ত

করিয়াছে। পবিত্র কোরআন তাহার প্রথম প্রকাশেই সৃষ্টি সম্পর্কে সমস্ত গর্হিত মতবাদ ও ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন করিয়া স্পষ্ট ঘোষণা দিয়াছে– একমাত্র আল্লাহ তাআলাই খালেক স্রষ্টা। পৃথিবীতে ধর্মের নামে যত অনাচার অবিচার ও গর্হিত মতবাদের ছড়াছড়ি হইয়াছে সবের মূলেই একটি মহাদোষ দৃষ্ট হয় যে, মানব সৃষ্টিকর্তার যথাযথ মর্যাদাদানে ভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত হইয়াছে। মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে তঁহার আসন হইতে নামাইয়া সৃষ্টিকে সেই আসনে বসাইবার চেষ্টা করিয়াছে। অধুনা খোদা নাই মতবাদের ধ্বজাধারীরাও ন্যাচার বা স্বভাবকে সেই আসনেই আসীন করিতেছে। অথচ ন্যাচার বা স্বভাব প্রকৃতিও আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি। সৃষ্টিকে সৃষ্টিকর্তার আসনে টানিয়া আনার এই মূল রোগের বিনাশ সাধনে কোরআন তাহার প্রথম কথায় বলিয়া দিতেছে– বিশ্ব চরাচরের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, বিশ্বের যাহা কিছু সমস্ত একমাত্র তাঁহারই সৃষ্টি।

এস্থলে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার অসংখ্য গুণবাচক নাম হইতে "রব" নাম গ্রহণ করা হইয়াছে। সৃষ্টির বিবর্তনের সহিত এই নামের বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধ অতি চমৎকার। "রব" শব্দের অর্থ বস্তুকে তাহার নগণ্য ও ছোট পর্যায় হইতে উন্নত ও বড় হওয়ার জন্য ধাপে ধাপে ক্রমে ক্রমে পূর্ণতায় উপনীতকারী। বিশ্ব চরাচরে সৃষ্টিসমূহের যে ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিবর্তন তাহা ন্যাচার বা স্বভাবের ক্রিয়া নহে; তাহা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি, তাঁহারই নিয়ম পদ্ধতি। "রব" শব্দের দ্বারা তাহা বুঝানই উদ্দেশ্য এবং তাহারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এখানে করা হইয়াছে। সৃষ্টির সেরা মানব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে– "যিনি মানবকে "আলাক"– রক্তপিণ্ড হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। কি বিচিত্র ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিবর্তন মানব সৃষ্টির মধ্যে। পবিত্র কোরআনেই বর্ণিত রহিয়াছে–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۔ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۔ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ۔ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۔ ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ۔ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ۔

অর্থাৎ আমি মানবকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহার মূল হইল– মাটি হইতে নিষ্কাশিত বস্তু (খাদ্য, যাহা মাটির রসে উৎপন্ন)। অতপর সেই বস্তুকে বীর্য বানাইয়াছি (খাদ্য হইতে রক্ত, রক্ত হইতে বীর্য)– যাহাকে জরায়ু প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ রাখিয়াছি। অতপর বীর্যকে রক্তপিণ্ড বানাইয়াছি। তারপর রক্তপিণ্ডকে মাংসখণ্ড বানাইয়াছি। তারপর ঐ মাংস খণ্ডের কিছু অংশকে হাড় বানাইয়া তাহাকে মাংস আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছি। তারপর (আত্মার সংযোজনে) তাহাকে ঐ বস্তুসমূহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক (বহুমুখী গুণাধার, অসাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক-বাহক এবং বিচিত্র রূপ-লাবণ্য ও সুন্দর নকশা-আকৃতির) সৃষ্টিরূপে দাঁড় করিয়াছি। কত বড় মহান সেই আল্লাহ তাআলা যিনি সুন্দর রূপদানে অতুলনীয়। তারপর হে মানব! তোমাকে মরিতে হইবে, অতঃপর কেয়ামত দিবসে তোমাকে পুনর্জীবিত হইতে হইবে (–সেই জীবনের আর শেষ নাই)। (পারা–১৮;রুকু–১)

ক্রমবিকাশ এবং ক্রমবিবর্তনের কি সুন্দর বিবরণ! প্রত্যেক ক্রম ও ধাপের বর্ণনার সহিত আল্লাহ তাআলা "খালাকনা" উল্লেখ করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, এক ধাপ হইতে অপর ধাপে যাওয়া একমাত্র আমার সৃষ্টি কার্যেই হইয়াছে; স্বয়ংকৃত স্বয়ম্ভূরূপে বা অন্য কোন কর্তার ক্রিয়ায় নহে। মানবের আদি হইতে অন্ত এবং অনন্ত পর্যন্তের সর্বময় ক্রমবিকাশের কি সুন্দর বর্ণনা ইহা। সর্বপ্রথম ওহীর মধ্যে এই দৃষ্টান্তেরই সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত দানপূর্বক আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি কর্তৃত্ব ব্যাপক আকারে দেখাইয়া শিরকের মূলোচ্ছেদ করা হইয়াছে।

আল্লাহ তাআলা স্রষ্টা, ইহার বিকাশ-পাত্রের নমুনারূপে মানব সৃষ্টির আদিকথা উল্লেখ করিয়াছেন– এখানেই আসিয়া গেল মানুষের পরিচয়। মানুষ কোথা হইতে আসিল? কে পয়দা করিল? এক্ষেত্রেও কোরআন

যাবতীয় মতবাদকে বাতিল করিয়া দিয়া স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছে যে, মানুষকে আল্লাহ তাআলাই পয়দা করিয়াছেন অতি নিকৃষ্ট ঘৃণার বস্তু বীর্য এবং রক্তপিণ্ড হইতে।

মহান আল্লাহর সর্বশক্তিমত্তার কি সুস্পষ্ট বিকাশ! একটা নিকৃষ্ট বস্তু রক্তপিণ্ডের মধ্যে আল্লাহ তাআলা মানুষের অসাধারণ শক্তি সম্ভাবনা পুঁতিয়া রাখিয়াছেন, তারপর ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া সেই রক্তপিণ্ডকে জ্ঞান বিবেকসম্পন্ন অসংখ্য অসাধারণ গুণাবলীর আকররূপে শক্তিশালী সুশ্রী মানুষে পরিণত করিয়াছেন।

মানুষের মহারত্ন জ্ঞান সম্পর্কেও কোরআন সুস্পষ্ট ধারণা ও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছে যে, আল্লাহ তাআলাই মানুষকে জ্ঞান দান করিয়াছেন। এই ব্যাপারেও আল্লাহর মহাশক্তিমত্তার উল্লেখপূর্বক বলা হইয়াছে– এই মহারত্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান আল্লাহ তাআলা মানুষকে দিয়াছেন নির্জীব লেখনীর মাধ্যমে। জগতের দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় লেখনীর মাধ্যমেই জন্মলাভ করিয়া প্রসারিত হয় এবং মানুষ তাহা আহরণ করে। তারপর আরও বলা হইয়াছে, বহু অজানা জ্ঞান আল্লাহ তাআলা মানবকে বিভিন্ন উপায়ে দান করিয়াছেন।

জ্ঞান দুই প্রকার ঃ (১) জাহেরী অর্থাৎ যেই জ্ঞানলব্ধ বিষয়বস্তু বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; যেমন জাগতিক দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস ইত্যাদি। (২) বাতেনী অর্থাৎ যেই জ্ঞানলব্ধ বিষয়বস্তু বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে; যেমন "হাকায়েক" তথা তত্ত্বজ্ঞান এবং "মাআরেফ" তথা আধ্যাত্মজ্ঞান। জাহেরী জ্ঞান সাধারণতঃ লেখনীলব্ধ, আর বাতেনী জ্ঞান মূলতঃ প্রত্যক্ষ সত্য দর্শন বা সত্যের সাক্ষাতলব্ধ কিন্তু বাহ্যিক উপকরণ বা বাহ্যিক চর্চার মাধ্যমে ইহার অধিক উন্মেষ হইতে পারে। এই উভয় প্রকার জ্ঞান মানুষের দুই পথে লাভ হইতে পারে– (১) লেখনী চর্চা, শিক্ষা ইত্যাদি কোন উপকরণ বা বাহনের মাধ্যমে; ইহাকে "এল্‌মে কসবী" বলা হয়। (২) কোন উপকরণ বা বাহনের মাধ্যম ব্যতিরেকে শুধু আল্লাহর দান ও অনুগ্রহে; ইহাকে "ইল্‌মে লাদুন্নী" বলা হয়।

এখানে প্রথমে কলমের সাহায্যে জ্ঞান দানের উল্লেখপূর্বক এল্‌মে কসবীর ইঙ্গিত করিয়া বলা হইয়াছে, মানুষকে আল্লাহ তাআলা বহু অজানা জ্ঞান দান করিয়াছেন। অর্থাৎ উভয় পথের জ্ঞান তাহাকে দেওয়া হইয়াছে।

লক্ষ্য করুন! ওহী ও পবিত্র কোরআনের আরম্ভ উদ্বোধন (Opening) এবং প্রথম প্রকাশ (Beginning) কত মধুর! কত গুরুত্বপূর্ণ। কত সুন্দর! সব রকম উৎকর্ষ সাধন প্রণালী শিক্ষা দানে তাহা আরম্ভ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে– প্রত্যেক কাজের প্রারম্ভে আল্লাহর নামের সাহায্য সম্বল গ্রহণ করিবে; অর্থাৎ "বিসমিল্লাহ" বলিয়া আরম্ভ করিবে; যাহার অর্থ হইবে– হে আল্লাহ! আমি তোমারই সাহায্য কামনা করি, তোমারই প্রত্যাশা রাখি; তুমি সর্বশক্তিমান ভিন্ন অন্য কোন শক্তির প্রতি আমার প্রত্যাশা নাই– তুমি ত ধরা-ছোঁয়া এমনকি বর্তমান চোখে দেখারও উর্ধ্বে, তাই তোমার নামের উসিলায় তোমার সাহায্য কামনা করি।

এই আদর্শের ইঙ্গিতের পর সম্পূর্ণ কোরআন এই আদর্শের উপরই অবতীর্ণ হইয়াছে– কোরআনের প্রতিটি সূরার প্রারম্ভেই "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রারম্ভের আদর্শ সর্বাগ্রে ব্যক্ত হইতে হইবে, অতএব সর্বাগ্রে এই আয়াত নাযিল হওয়াই অতি সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়াছে।*

এই আদর্শ অতি গুরুত্বপূর্ণ; ইহাতেই শেরকের ছিদ্রপথ বন্ধ হইবে, যাহা তওহীদ– একত্ববাদের প্রথম সোপান; যেই তওহীদের জন্যই ইসলাম, কোরআন ও রসূল। ইহারই সঙ্গে সঠিক ধারণা ও সত্য জ্ঞান দান করা হইয়াছে সর্ব উর্ধ্বের দর্শন সম্পর্কে– (১) আল্লাহর পরিচয়, (২) নিখিল সৃষ্টি কোথা হইতে আসিল? (৩)

* "বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম" পবিত্র কোরআনের একটি বিচ্ছিন্ন আয়াত, সূরার অংশবিশেষ নহে। প্রত্যেক সূরার আরম্ভেই তাহা বার বার শুভ আরম্ভরূপে অবতীর্ণ হইত। সূরা "ইকরা"–র প্রারম্ভে ইহা অবতীর্ণ হয় নাই বটে, কারণ তাহার দ্বারা প্রারম্ভের আদর্শ ত এই সূরায়ই ব্যক্ত হইয়াছে। অবশ্য পরে ঐ আদর্শের সামঞ্জস্যে এই সূরার শুভ প্রারম্ভেও "বিসমিল্লাহ" সংযোজিত হইয়াছে; ছাহাবীগণের যুগ হইতেই ইহা করা হইয়াছে। (যোরকানী, ১–২১২)

বিশেষতঃ মানুষের সৃষ্টি বৃত্তান্ত কি? (৪) মানুষের মূল বৈশিষ্ট্য জ্ঞান– যাহার দ্বারা মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরারূপে যাবতীয় জীব হইতে পৃথক ঊর্ধ্বের স্থান লাভ করিয়াছে; সেই জ্ঞানরত্ন কোথা হইতে লাভ হইয়াছে? এইসব তত্ত্বের রহস্য উদঘাটনই সকল দর্শনের সেরা দর্শন।

পবিত্র কোরআন তাহার প্রথম প্রকাশেই এই গুরুত্বপূর্ণ জটিল প্রশ্নসমূহের সমাধান ঘোষণা করিয়াছে যে– এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে একজন সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্তা আছেন; তিনিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহার ইঙ্গিতেই ইহা পরিচালিত হইতেছে। সমস্ত সৃষ্টি তাঁহার সৃষ্টিকর্ম হইতেই আসিয়াছে; মানুষকে তিনিই পয়দা করিয়াছেন; মানুষের বৈশিষ্ট্য জ্ঞানরত্ন তিনিই তাহাকে দান করিয়াছেন। এই বিজ্ঞানের যুগে বৈজ্ঞানিকগণ এইসব প্রশ্নের উত্তর হাতড়াইয়া বিভিন্ন মতবাদ আবিষ্কার করিয়াছে– তাহা সবই শুধু কল্পনা ও ধারণা তথা ধরিয়া নেওয়া; তাই ঐসব মতবাদে ভাঙ্গা গড়া হইয়াছে এবং হইবে। বিজ্ঞান আবিষ্কারের বহু পূর্বেই পবিত্র কোরআন এইসব প্রশ্নের সমাধানে সত্যের সন্ধান দান করিয়াছে– তাহাই পবিত্র কোরআনের প্রারম্ভ।

১৬৭৩। হাদীছ ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি সর্বপ্রথম ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে (তিনি নবুয়তপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন) যখন তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। নবুয়তপ্রাপ্তির পর তিনি তের বৎসর মক্কায় অবস্থান করিয়াছেল। অতপর আল্লাহর আদেশে মদীনায় হিজরত করিয়া আসেন এবং তথায় দশ বৎসরকাল অতিবাহিত করার পর ইহজগত ত্যাগ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ সপ্তাহের যেদিনে হযরত নবুয়তপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা ছিল সোমবার দিন। ইহা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। (একমাল ১–৩০)

এই সম্পর্কে মুসলিম শরীফে একখানা হাদীছও উল্লেখ আছে– হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) সোমবারে নফল রোযা রাখিয়া থাকিতেন; সেই সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছেন, ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت او انزل على فيه ـ অর্থাৎ এই সোমবার দিন আমি জন্মলাভ করিয়াছি এবং এই সোমবার দিন আমি নবুয়তপ্রাপ্ত হইয়াছি বা আমার উপর ওহী অবতরণ আরম্ভ হইয়াছে।

এই দিনটি কোন্ মাসের কোন্ তারিখ ছিল সে সম্পর্কে নবুয়তের ইতিহাস বর্ণনাকারীদের মতভেদ আছে। কাহারও মতে রবিউল আউয়াল মাসের ঐ তারিখে সেই তারিখে তাঁহার জন্ম ছিল। এই সূত্রে হযরতের নবুয়তপ্রাপ্তি সঠিকরূপে তাঁহার বয়সের চল্লিশ বৎসরের সময়েই ছিল; যেরূপ উল্লিখিত হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে নবুয়তপ্রাপ্তি নবীজীর বয়স চল্লিশ বৎসর পার হইয়া যাওয়ার পর রমযান মাসে ছিল। অনেকের মতে রমযান মাসের শেষ দশকের কোন রাত্রে ছিল যেই রাত্র "লাইলাতুল কদর"। এই সূত্রে নবুয়ত প্রাপ্তিকালে হযরতের বয়স চল্লিশ বৎসর ছয় মাস আরও কিছু বেশী দিন ছিল। পবিত্র কোরআনে ইহার ইঙ্গিত ও সমর্থন পাওয়া যায়– شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنَ "রমযান মাসে কোরআন অবতারিত হইয়াছে।" আর কোরআন অবতরণ হইতেই নবুয়তের আরম্ভ ছিল। এতদ্ভিন্ন এই সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের আরও মতামত বর্ণিত আছে।

প্রথম প্রকাশের পর

হেরা গুহায় নবীজী মোস্তফা (সঃ) আল্লাহ তাআলার সদ্য অবতারিত কালাম প্রাপ্ত হইলেন; আল্লাহর প্রেরিত দূত নূরে পয়দা ফেরেশতা জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালামের সাক্ষাত লাভ করিলেন। তারপর আর ওহী আসে না; জিব্রাঈল ফেরেশতার আনুষ্ঠানিক আগমন হয় না। ওহী বন্ধের এই বিরহ যাতনা নবীজীর জন্য কিরূপ হইয়া দাঁড়াইল তাহা ব্যক্ত করা ত সম্ভব নহে, তবে লক্ষ-কোটি ভাগের এক ভাগরূপে আংশিক

উপলব্ধি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে লাভ হইতে পারে।

রাজত্বের মোহে মুহ্যমান ব্যক্তি ইহা রাজত্ব লাভ করার পর রাজ্যহারা হইলে বা ধনের মায়া ও আকর্ষণে নিমজ্জমান ধনী ধনহারা হইয়া পড়িলে, সন্তানের মায়া মহব্বতে ব্যাকুল একটি মাত্র সন্তানের মা সন্তানহারা হইলে– এইসব ক্ষেত্রে প্রিয়হারা ব্যক্তি তাহার ক্ষণস্থায়ী প্রিয় বস্তু হারাইয়া যেরূপ মানসিক পীড়া ও যাতনায় পতিত হয়, আধ্যাত্মিক জগতে সাফল্য ও উন্নতিকামীগণ আল্লাহর নৈকট্য, আল্লাহর মারেফাত, আল্লাহর দেওয়া ঐ জগতের যত সম্পদ, তাহাতে বিন্দুমাত্র লাঘব দেখিলে তাঁহারা ঐ ক্ষণস্থায়ী প্রিয়হারাদের অপেক্ষা লক্ষ কোটি গুণ অধিক পীড়া ও যাতনায় পতিত থাকেন। দার্শনিক রুমী (রঃ) বলেন–

گر زباغ دل خلالے کم بود - بر دل سالك هزاران غم بود

অর্থ ঃ "সালেকের অন্তর বাগানে একটি তৃণেরও যদি লাঘব ঘটে তবে তাঁহার অন্তরে হাজার হাজার ব্যাকুলতার ঢেউ খেলিতে থাকে।"

আধ্যাত্মিক জগতের ছোট্ট শিশু, যে সবেমাত্র ঐ পথে হাঁটা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাকে সূফীবাদের পরিভাষায় "সালেক" বলা হয়। আধ্যাত্মিক জগতে এই শিশু সালেকের তুলনায় নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শ্রেণী ও স্থান কত ঊর্ধ্বে তাহা সহজেই অনুমেয় এবং সেই পরিমাণেই ঐরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার ব্যাকুলতার পরিমাপ হইবে।

তদুপরি আলোচ্য ক্ষেত্রে নবীজী মোস্তফা (সঃ) আধ্যাত্মিক জগতের তৃণহারা হইয়াছিলেন না, বরং মহা রত্নহারা হইয়াছিলেন; চির বাঞ্ছিত বস্তু পাইয়া তাহা হইতে নিজেকে বঞ্চিত মনে করিতেছিলেন। ওহী তথা আল্লাহর বাণী প্রাপ্তির সময় আল্লাহর সঙ্গে যেই দৃঢ় নিকটবর্তী যোগ সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহর নৈকট্য সান্নিধ্যের যে স্বাদ লাভ হয় তাহা অতুলনীয়। অতএব তাঁহার ব্যাকুলতা, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ছিল বর্ণনাতীত। ওহীর বিরহ যাতনা নবীজীর জন্য কোন কোন সময় অসহনীয় হইয়া উঠিত; পর্বতশৃঙ্গ হইতে নিজেকে ফেলিয়া দিয়া ইহলোক ত্যাগ করার ন্যায় উত্তেজনা পর্যন্ত তাঁহার মধ্যে সৃষ্টি হইতে চাহিত।* এইরূপ মুহূর্তে জিব্রাঈল (আঃ) আত্মপ্রকাশ করিতেন এবং আশার ইঙ্গিতদানে সান্ত্বনা বাণী শুনাইতেন–

يا محمد انك رسول الله حقا -

"হে মুহাম্মদ! নিশ্চয় আপনি আল্লাহ তাআলার বরহক রসূল।" অর্থাৎ আপনি বিচলিত হইবেন না, আপনার হারানিধি আপনার নিকট আসিবেই। জিব্রাঈলকে দেখিলে এবং ঐ বাণী শুনিলে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অন্তর অগ্নিতে কিছুটা পানির ছিটা পড়িত। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ দৌলত আল্লাহ তাআলার বাণী পুনঃ না পাওয়ায় যে ব্যাকুলতা ছিল তাহা বিদুরিত হইত না।

এতদ্ভিন্ন রত্নহারা মানুষের অন্তরে কতই না সংশয়ের সৃষ্টি হয়। কত ধারণারই না জন্ম হয়! সত্য প্রবাদ–

---

* **সমালোচনাঃ** ওহীর বিচ্ছেদে নবীজী (সঃ)-এর বিরহ যাতনায় সৃষ্ট এই শ্রেণীর ত্রাস ও উত্তেজনাকে "মোস্তফা-চরিত" গ্রন্থে অস্বীকার করা হইয়াছে, অথচ তথায়ই এই বর্ণনার প্রমাণও উল্লেখ রহিয়াছে। সনদের মারপেঁচে ফেলিয়া প্রমাণটাকে খণ্ডন করা হইয়াছে। জানি না এই বর্ণনায় খাঁ সাহেবের গাত্রদাহ কেন জন্মিল? তবে তাঁহার ত চিরাচরিত স্বভাব– পাণ্ডিত্য ত তাঁহার আছেই; তিনি কোন বর্ণনাকে এনকার করার ইচ্ছা করিলে অতি বক্র ভাষায় ব্যক্ত করেন, যেন পাঠক নিজেই তৎপ্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে; যেমন আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনায় তিনি বলেন– "তিনি (নবীজী) মধ্যে মধ্যে পর্বত শিখর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন? (পৃষ্ঠ–২৬৫) বিবরণ, উদ্ধৃতির কি জঘন্য ভঙ্গি! খাঁ সাহেবের এই বিবরণ ভঙ্গিতে মনে হয় তিনি বলিতে চাহেন– আত্মহত্যা মহাপাপ, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসছল্লাম তাহার সংকল্প কিরূপে করিতে পারেন?

এই প্রশ্ন নিতান্তই দার্বল। কারণ, ইহা ত আভ্যন্তরীণ মনোবেদনা ও বিরহ জ্বালায় মনের ক্ষোভ প্রকাশ করা মাত্র; কার্যে বাস্তবায়িত করার দৃঢ় সংকল্প করিয়া নেওয়া মোটেই উদ্দেশ্য নহে। যেমন হাদীছে আছে– নবঙ্কজী (সঃ) বলিয়াছেন, "যাহারা নামাযের জামাতে উপস্থিত হয় না, আমার ইচ্ছা হয় তাহাদেরকে গৃহে রাখিয়া আগুন লাগইয়া দেই।" অথচ এইরূপ করা কি মহাপাপ নহে? এরূপ ক্ষেত্রে পাপ-পুণ্যের মাসআলার অবতারণা নিছক বোকামি। ক্রোধে ক্ষুব্ধ ব্যক্তি বলে– "মন চায়, তোকে কাঁচা মরিচের ন্যায় চিবাইয়া খাইয়া ফেলি।" এক্ষেত্রে কি প্রশ্ন হইবে যে, মানুষের গোশত হারাম, পেটে মল-মূত্র; কিরূপে চিবাইয়া খাইবেন?

عشق است هزار بد گمانی "ভালবাসা হাজার হাজার দ্বিধা সংশয়ের কারণ।" প্রাণপ্রিয় ওহী হারাইয়া নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর অন্তরে কত শত সংশয় ও আতঙ্কেরই না সৃষ্টি হইতেছিল! এমনকি এইরূপ আতঙ্কের ভাব সৃষ্টিও বিচিত্র ছিল না যে, প্রভু কি আমাকে ছাড়িয়া দিলেন? আমার প্রতি তিনি কি বিরাগী হইয়া গেলেন?

শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ (রঃ) ফাওয়ায়েদে কোরআনে তফসীর ইবনে কাসীরের বরাত দানে লিখিয়াছেন– নবীজীর নবুয়ত প্রাপ্তির সংবাদ যাহারা শত্রুতার সহিত গ্রহণ করিয়াছিল, ঐ শ্রেণীর শত্রুরা এই সুযোগে নবীজীর কাঁটা ঘায়ে লেবুর রস দেওয়ার ন্যায় কটাক্ষ করিয়া থাকিত, উপহাস করিত– "মুহাম্মদের প্রভু তাহার প্রতি রাগ করিয়াছেন, তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।" মনো ব্যথার প্রতিক্রিয়ায় নবীজীর দেহেও অবসাদ ছিল, তাই রাত্রের এবাদতে তিনি কতেক দিন জাগ্রত হন নাই; ইহা লক্ষ্য করিয়া এক হতভাগিনী শত্রুও ঐরূপ কটাক্ষপাত ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উক্তি করিয়া বেড়াইত।

এরই মধ্যে আর কেটি ছোট্ট সূরা নাযিল হইয়া নবীজীর ব্যথিত হৃদয়ে মহাপ্রলেপের ক্রিয়া করিল এবং তাঁহার ভাঙ্গা বুককে শক্তিশালী করিয়া তুলিল।

وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجٰى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى - وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى - وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى - اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى - وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى - وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنٰى -

দীপ্ত প্রভাত ও গভীর রজনীর শপথ– আপনার প্রভু আপনাকে ত্যাগ করেন নাই, আপনার প্রতি বিরাগীও হন নাই। আপনার ভবিষ্যত অতীত অপেক্ষা নিশ্চয় অনেক উজ্জ্বল। আপনার প্রভু আপনার প্রতি মহাদানে অবশ্যই আপনাকে সন্তুষ্ট করিবেন। আপনি কি ছিলেন না এতীম; সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনাকে আশ্রয় দিয়াছেন? মহাজ্ঞান ও সহাসত্যের অবগতি আপনার ছিল না– তাহার সন্ধানে আপনি ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছিলেন, তিনি আপনাকে মহাজ্ঞান মহাসত্যের পথ দান করিয়াছেন। আপনি ছিলেন নিঃস্ব তিনি আপনাকে ধনাঢ্য করিয়াছেন।

দীপ্ত প্রভাত গভীর রজনীর উল্লেখ এই ক্ষেত্রে কতই না সুসামঞ্জস্যপূর্ণ! আলোর পরে অন্ধকার, দিনের পরে রাত্রি, ইহা স্বভাব– সৃষ্টির ধারা ও নীতি; ইহা দ্বারা সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির বিচার ও সিদ্ধান্ত নেওয়া ভুল। রাত্রির অন্ধকার আসিলে কি বলা হইবে, প্রভু বিশ্ববাসীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন? শান্তির অবলম্বন নিদ্রার জন্য কি রাত্রি ও অন্ধকার বড় নেয়ামত নহে? জোয়ারের পরে কি ভাঁটা আসে না? ভাটার পরে কি জোয়ার আসে না? আপনার এই ভাঁটা মহাজোয়ারের পূর্বাভাস। বর্তমানে সাময়িক অন্ধকারদৃষ্টে আপনি মোটেই মন ভাঙ্গিবেন না; অতীতে আপনার জীবনের কত অন্ধকারে প্রভু আপনাকে আলো দান করিয়াছেন! এতিমীর অন্ধকারে আশ্রয়ের আলো দিয়াছেন, উর্ধ্ব জ্ঞানর ও সত্যের পিপাসায় ব্যাকুলতার অন্ধকারে মহাসত্যের আলো দান করিয়াছেন, দারিদ্র্যের অন্ধকারে অভাব মুক্তির আলো দিয়াছেন। তদ্রূপই বর্তমানের প্রিয় হারার অতি সাময়িক অন্ধকারের পরেই দীপ্ত প্রভাতের আশা লইয়া অগ্রসর হউন– ভয় নাই, আশঙ্কা নাই; আপনার সাফল্য সুনিশ্চিত।*

এরপর আর ভীতি কি? কুণ্ঠা কী? নবীজী মোস্তফা (সঃ) উৎসাহ-উদ্দীপনার উৎস পাইয়াছেন; আর কোন বাধা-বিঘ্ন, অত্যাচার-উৎপীড়ন তাঁহাকে দমাইতে পারে কি? এই সূরার বিবরণধারাই পাঠককে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দেয়।

সত্য প্রচারের আদেশ

দীর্ঘ চল্লিশ দিন বা ছয় মাস, কাহারও মতে আরও অধিক দিন অতিবাহিত হইল; নূতন কোন বাণী আসে

* সূরা ওয়ায়যোহার অবতরণ যে "ফাত্‌রাত" তথা সাময়িক ওহী বন্ধের উপলক্ষে ও সংলগ্নে ছিল– ইহা মাওলানা শাব্বীর আহমদ (রঃ)-ও তাঁহার ফাওয়ায়েদে কোরআনে উল্লেখ করিয়াছেন।

না, জিব্রাঈল ফেরেশতার আনুষ্ঠানিক আগমন এবং সাক্ষাত হয় না। তাই নবীজী (সঃ) ব্যাকুলতার মধ্যে কালাতিপাত করিতেছেন। অবশেষে তিনি সেই হেরা গুহায় যাইয়া দিবা-নিশি অবস্থান করিতে লাগিলেন; হযরত ভাবিলেন, যেস্থানে একবার প্রাণপ্রিয় বিষয় লাভ হইয়াছিল, তথায়ই ধরণা পাতিয়া থাকি। সেমতে দীর্ঘ এক মাসের এতেকাফের নিয়তে তিনি তথায় থাকিলেন। এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর গৃহাভিমুখে আসিতেছেন। স্বয়ং নবীজীর বর্ণনা– হেরা পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া তাহার পদস্থ নিম্নভূমি অতিক্রম কালে মধ্যবর্তী স্থানে আসিলে পর আমি একটা আহ্বান শুনিতে পাইলাম। ডানে-বামে, সম্মুখে-পিছনে তাকাইলাম, কোন কিছু দেখিলাম না। অতপর উপর দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, পূর্ব পরিচিত সেই ফেরেশতা জিব্রাঈল, যিনি হেরা গুহায় প্রথম বার আল্লাহর বাণী নিয়া আসিয়াছিলেন– তিনি আমার দৃষ্টিগোচরে উদ্ভাসিত। অবশ্য সেই আকৃতিতে নহেন; তাঁহার ব্যক্তিগত আসল আকৃতিতে বিরাট অপেক্ষা বিরাট তাঁহার আকৃতি, সবুজ রং ভেলবেট বা মখমলরূপে ছয় শত ডানাবিশিষ্ট– তিনি কুর্সির উপর আকাশ প্রান্তে এক আসনে উপবিষ্ট। তাঁহার আকৃতি এত বিরাট যে, আসমান যমীনের মধবর্তী সমগ্র প্রান্তকে পরিপূর্ণ করিয়া আছেন।

হযরত নবী (সঃ) জিব্রাঈল (আঃ)-কে এই আকৃতিতে সারা জীবনে দুই বার দেখিয়াছেন, দ্বিতীয় বার মে'রাজ ভ্রমণ উপলক্ষে সপ্তম আসমানের উপর সেদ্‌রাতুল মোন্তাহার নিকট– যাহার আলোচনা পবিত্র কোরআন সূরা নাজমে রহিয়াছে। ঐ সময় নবীজী মোস্তফা (সঃ) স্বীয় শক্তি সামর্থ্যে পাকা-পোক্ত হইয়াছিলেন। তদুপরি মে'রাজ ভ্রমণ উপলক্ষে বক্ষ বিদীর্ণের দ্বারা বেহেশতী পরিপুষ্টিকর বস্তুতে তাঁহাকে অধিক শক্তিমান করিয়া তোলা হইয়াছিল। আলোচ্য ঘটনায় নবুয়তের প্রারম্ভ, দীর্ঘ দিন হইতে বিরহ যাতনার বিহ্বলতায় ভুগিতেছেন, দীর্ঘ এক মাস পর্বত গুহায় কাটাইয়া সবেমাত্র বাহিরে আসিয়াছেন; এমতাবস্থায় মানবীয় দেহের উপর চর্ম চোখের দৃষ্টিতে অতি অস্বাভাবিক বস্তু দর্শনের প্রতিক্রিয়া তিনি সামলাইতে পারিলেন না। নবীজী (সঃ) ঐ দৈব দেহীকে চিনিতে পারেন নাই তাহা নহে; তিনি নিজেই বর্ণনা দিয়াছেন, ঊর্ধ্ব দিকে দৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে হেরা গুহার সেই পূর্ব পরিচিত ফেরেশতাকে দেখিতে পাইলাম। (প্রথম খণ্ড ৪ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য) এতদসত্ত্বেও হযরত (সঃ) বলেন, আমি চমকিত ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম। ঐ অবস্থায় জিব্রাঈল মানুষবেশে নিকটে আসিয়া আমাকে সান্ত্বনা দিলেন। তথা হইতে উঠিয়া বাড়ী আসিলাম, তখনও সেই চমকের শিহরণ আমার উপর ছিল, তাই গৃহবাসীদেরকে আমি বলিলাম– دثرونى وصبوا على ماء باردا "আমাকে চাদর মুড়িয়া দাও, আমাকে চাদর মুড়িয়া দাও এবং আমার উপর ঠাণ্ডা পানি ঢাল।" তাহারা আমাকে ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করাইয়া দিল এবং চাদর মুড়িয়া দিল। সেই অবস্থাতেই জিব্রাঈল ফেরেশতা ওহী নিয়া আসিলেন–

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ قُمْ فَأَنْذِرْ ـ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ـ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ـ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ـ وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ ـ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ـ

অর্থ ঃ "হে চাদর মুড়ি দেওয়া! উঠ; (চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া থাকার সময় নহে; এখন উঠ) এবং বিশ্ববাসীকে সতর্ক কর, নিজ প্রভু-পরওয়ারদেগারের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা কর, নিজের বাহির-ভিতরকে পবিত্র রাখ, ভিতর-বাহিরের সমস্ত দেবদেবীকে পরিহার করার উপর দৃঢ় থাক। উপকার করিয়া অধিকতর প্রত্যুপকার প্রাপ্তির ইচ্ছা ও আশা পোষণ করিও না। (নবীজীর দায়িত্বের পথে ইহা মহা উপদেশ। কোরআনের বয়ান– সকল নবীগণই বলিতেন, দায়িত্ববোধেই দায়িত্ব পালন; তোমাদের হইতে কিছু পাইতে চাই না। দায়িত্বের বোঝা উঠাইবার প্রারম্ভেই এই উপদেশ।) স্বীয় প্রভুর কৃতজ্ঞতায় (তাঁহার পথে) ধৈর্যাবলম্বন করিও।"

সমস্ত যোগাড়-আয়োজন সম্পন্ন হইয়াছে, জ্ঞান সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইয়াছে; আজ হইতে মহাপুরুষের কর্ম সাধনা আরম্ভ হইবে। মৌন ভাবুক, ধ্যানগম্ভীর মহাত্মাকে কর্তব্য পালনে দৃঢ়তার সহিত কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের আদেশ আসিল। ইহা পবিত্র কোরআনের দ্বিতীয় প্রকাশ– কত সুন্দর! কত আবেগময়ী! কিরূপ মধুর স্বরে বিপ্লবে ঝাঁপাইয়া পড়ার আহ্বান!

প্রথমে জড়তা পরিহারে সংগ্রামী পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হইল; সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য কর্মের প্রকৃত স্বরূপ এবং মূল বিষয়বস্তু স্পষ্টতঃ বলিয়া দেওয়া হইল– বিশ্ব বুকে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহই শ্রেষ্ঠ, আল্লাহই বড়, সর্বক্ষেত্রে ইহার বিকাশ সাধন করিতে হইবে, ইহাই হইল ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম জাতীয়তার একমাত্র স্মারক– "আল্লাহু আকবার" আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম মহত্তম বিরাটতম। প্রতিটি মুসলমান জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত এই আল্লাহু আকবারেই আবেষ্টিত। জন্মঘরে শিশুর কর্ণকুহরে সর্বপ্রথম এই ধ্বনিই প্রবেশ করে, প্রতিদিন দিবারাত্রে পাঁচবার মুসলিম জাতির সর্বত্রই এই ধ্বনি বারংবার গর্জিত হয় এবং ঈদে, আনন্দ-উৎসবে এই ধ্বনি উচ্চারিত হয়। সর্বশেষে প্রতিটি মুসলমানকে এই ধরণী হইতে চিরবিদায় দানকালে জানাযার নামাযে তাহার প্রতি আল্লাহু আকবারের চারিটি ধ্বনি দিয়া সমাহিত করা হয়। মুসলিম জীবনের সহিত আল্লাহু আকবার– আল্লাহর মহত্ত্ব বড়ত্বের ধ্বনি এমনিভাবে ওতপ্রোতরূপে বিজড়িত। আলোচ্য আয়াতে সেই আল্লাহর মহত্ত্ব ও বড়ত্বই প্রতিষ্ঠার আদেশ করা হইয়াছে।

নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে বিশ্ব নেতৃত্বের পটভূমিতে দাঁড় করান হইতেছে, তাই নেতৃত্ব পদের জন্য যাহা বিশেষ প্রয়োজন তাহারও আদেশ এস্থলে করা হইয়াছে। নেতৃত্বের পদে যিনি ব্রতী হইবেন সর্বপ্রথমে সকল প্রকার কলুষ হইতে তাঁহাকে আত্মশুদ্ধি করিতে হইবে, দৈহিক এবং মানসিক সর্বপ্রকার বিকার সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে হইবে এবং সাধনার পথে পর্বতের ন্যায় অটল, আকাশের ন্যায় বিশাল হৃদয় লইয়া দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। এইসব গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশই দেওয়া হইয়াছে এই ছোট ছোট আয়াত কয়টিতে। নবীজীর জন্য ইসলামের কর্ম ময়দানে যাত্রার প্রাক্কালে এই নির্দেশসমূহ কতই না সুন্দর! কতই না শ্রেয়!!

তারপর ঘন ঘন ওহীর আগমন হইতে থাকিল, কোরআন শরীফের আয়াতও নাযিল হইত এবং শরীয়তের হুকুম-আহকামও নাযিল হইত। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায ত নবুয়ত প্রাপ্তির দশ বৎসর পর মে'রাজ শরীফে ফরয হইয়াছে। তাহার পূর্বে এই প্রথম অবস্থায় সকাল-বিকালের দুই ওয়াক্ত নামায ফরয হইয়াছিল।

সর্বপ্রথম ফরয– নামায

একদা জিব্রাঈল (আঃ) নবী (সঃ)-কে এক পাহাড়ের আড়ালে নিয়া গেলেন এবং পায়ের গোড়ালি দ্বারা যমীনে আঘাত করিলেন, তাহাতে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হইল। জিব্রাঈল (আঃ) স্বয়ং অযূ করিয়া নবী (সঃ)-কে অযূ শিক্ষা দিলেন। অতপর জিব্রাঈল (আঃ) ইমাম হইয়া দুই রাকআত নামায পড়াইলেন। নবী (সঃ) মোক্তাদী হইয়া নামাযে শরীক হইলেন এবং নামাযের পদ্ধতি শিক্ষা করিলেন। তথা হইতে নবীজী (সঃ) বাড়ী আসিয়া বিবি খাদীজা (রাঃ)-কে এবং যে কতিপয় লোক মুসলমান হইয়াছিলেন সকলকে অযূ এবং নামায শিক্ষা দিলেন। সকলেই পাহাড়-পর্বতের আড়ালে গোপনে লুকাইয়া লুকাইয়া নামায পড়িতেন। প্রথমে শুধু সকাল-বিকাল দুই ওয়াক্ত দুই দুই রাকাতের নামাযই ফরয ছিল, তারপর সূরা মোযযাম্মেল নাযিল হইয়া তাহাজ্জুদ নামাযেরও আদেশ হয়– أَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ "দিনের দুই দিকে এবং রাত্রের অংশে নামায আদায় করিবে।" (সীরাতে মোস্তফা, ১–১১৪)

একদা নবী (সঃ) আলী (রাঃ)-সহ গোপনে এক জায়গায় নামায পড়িতেছিলেন। হযরতের চাচা– আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিতা আবু তালেব হঠাৎ তথায় পৌঁছিলেন। নামায শেষে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি করিলে? নবীজী (সঃ) বলিলেন, আল্লাহ পাক আমাকে তাঁহার রসূল বানাইয়াছেন, মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহার এক বিশেষ এবাদত ফরয করিয়াছেন– ইহা সেই এবাদত চাচাজান! আপনিও এই ধর্ম গ্রহণ করুন। আবু তালেব বলিলেন, বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করা ত সম্ভব নহে তবে তোমরা তোমাদের কাজ চালাইয়া যাও; সর্বদা আমার সাহায্য তোমাদের পক্ষে থাকিবে। আলী (রাঃ)-কেও অভয় দিলেন। (আসাহ্হুস সিয়ার–৭১)

পবিত্র কোরআনে এই বিশেষ ওহীতে যে আদেশ ছিল, قُمْ فَأَنْذِرْ "উঠুন! সতর্ক করুন।" এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে নবীজী (সঃ) ইসলামের প্রচার আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অতি গোপনে। নবীজী (সঃ) তাঁহার কর্তব্য লইয়া প্রথম দাঁড়াইলেন; যে পয়গাম তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে মানুষের প্রাণের দুয়ারে তাহা পৌঁছাইবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন। এই শুভ যাত্রায় নবীজী মোস্তফা (সঃ) আপন সহধর্মিণী বিবি খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার পূর্ণ সমর্থন-সহায়তা লাভ করিলেন।

সর্বপ্রথম মুসলমান বিবি খাদীজা (রাঃ)

বিবি খাদীজা (রাঃ) ইসলামের সূর্যোদয়ের প্রথম প্রভাতেই নবীজীর প্রতি ঈমান আনিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক ছিল। খাদীজা (রাঃ) অপেক্ষা নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বেশী চিনিতে পারে কে? কে তাঁহার ভিতর-বাহির এমন সুন্দরভাবে দেখিতে পারিয়াছে। তিনি ত তাঁহার জীবন সঙ্গিনী।

১। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রথম জীবনের সুনাম-সুখ্যাতিতে বিবি খাদীজা (রাঃ) পূর্ব হইতেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন।

২। সিরিয়ার বাণিজ্য সফরে বিবি খাদীজার ক্রীতদাস মায়সারা নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অনেক অলৌকিক ঘটনার সাক্ষ্য বহন করিয়াছিল।

৩। দীর্ঘ পনর বৎসরকাল নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবন সঙ্গিনী থাকিয়া খাদীজা (রাঃ) তাঁহার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

৪। হেরা গুহার সমস্ত ঘটনা নবীজী (সঃ) বিবি খাদীজাকে খুলিয়া বলিয়াছিলেন।

৫। অবশেষে বিবি খাদীজার মুরব্বী সৎ-সাধু অভিজ্ঞ আলেম ওয়ারাকার স্পষ্ট সাক্ষ্য ও উক্তি বিবি খাদীজার সম্মুখেই ছিল।

এইসব কারণে অতি সহজেই বিবি খাদীজা (রাঃ) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া নিলেন; ইহাতে স্বাভাবিকভাবেই নবীজীর মনোবল বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তাই ইসলামের জয়যাত্রার পথে বিবি খাদীজার দান ও নৈতিক সহযোগিতার মূল্য ছিল অনেক বেশী। চারিপার্শ্বে সংশয়, ভয়-ভীতি ও নিরাশার অন্ধকার– কোথাও কোন বন্ধু নাই, সহায় নাই; এই সময় সত্যের অভিযানের প্রথম পদেক্ষেপেই নবীজী মোস্তফা (সঃ) নিজ স্ত্রীকে আপন দোসররূপে পাইলেন– ইহা নবীজীর জন্য এক বিরাট সাফল্য ছিল।

নবীজী মোস্তফা (সঃ) যে সত্য পয়গম্বর, তিনি যে তাঁহার বর্ণনা ও দাবীতে অকপট সত্যবাদী মিথ্যাবাদী নন, কৃত্রিম নন ইহারও সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে বিবি খাদীজার ইসলাম গ্রহণে। স্বামীর মধ্যে কোন শঠতা বা ভণ্ডামি থাকিলে স্বীয় গৃহিণীর কাছে তাহা গোপন থাকিতে পারে না; তাই কোন মানুষের সততার পক্ষে তাহার স্ত্রীর সাক্ষ্য সর্বপ্রকার সাক্ষ্যের ঊর্ধ্বে বিবেচিত হয়। ইসলামের কঠিন দিনে বিবি খাদীজার এই ভূমিকা নারী জাতির জন্য বিশেষ গৌরবই বটে।

দ্বিতীয় মুসলমান আলী (রাঃ)

নবীজীর চাচা ছিলেন আবু তালেব। আবু তালেবের আয় অপেক্ষা ব্যয় ছিল বেশী। তাঁহার পরিবারে লোক সংখ্যা বেশী। নবীজী (সঃ) খাদীজা (রাঃ)-কে শাদী করার পর দৈন্যমুক্ত হইয়াছিলেন, আবু তালেবের সাহায্যার্থে তাঁহার পুত্র আলীকে নবীজী (সঃ) নিজ প্রতিপালনে নিয়া আসিলেন, আলী (রাঃ) নবীজীর ব্যয় বহনে এবং তাঁহার গৃহেই থাকিতেন।

একদা নবীজী (সঃ) বিবি খাদীজা (রাঃ)-সহ নামায পড়িতেছেন, তখন আলীর বয়স দশ-বার বৎসর; আলী (রাঃ) নবীজী (সঃ)-কে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। নবীজী (সঃ) বলিলেন, ইহা আল্লাহর দ্বীনের কাজ; পয়গম্বরগণ সকলেই আল্লাহর দ্বীন লইয়া দুনিয়াতে আগমন করিয়াছিলেন। আমি তোমাকে এই

দ্বীন গ্রহণের আহ্বান জানাই; তুমি লাত ওজ্জা দেব-দেবীকে বর্জন কর। আলী (রাঃ) বলিলেন, ইহাতে সম্পূর্ণ নূতন কথা। আব্বাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি কিছু বলিতে পারি না। এই কথায় নবীজী (সঃ) বিব্রত হইলেন যে, সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ফাস হইয়া যাইবে, তাই তিনি আলী (রাঃ)-কে বলিলেন, হে আলী! তুমি যদি গ্রহণ নাও কর তবুও তুমি কাহারও নিকট ইহা প্রকাশ করিও না। আলী (রাঃ) তখন চুপ থাকিলেন; রাত্র অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলীর অন্তরের পরিবর্তন ঘটিল; প্রভাত হইতেই আলী (রাঃ) নবীজীর সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কিসের আহ্বান করিয়া থাকেন? নবীজী (সঃ) বলিলেন, এই স্বীকৃতি করিতে হইবে যে, আল্লাহ এক, তাঁহার কোন শরীক নাই এবং লাত-ওজ্জা ইত্যাদি দেব-দেবীকে বর্জন করিতে হইবে, মূর্তিপূজাকে চিরতরে ঘৃণা ও পরিহার করিতে হইবে। আলী (রাঃ) তৎক্ষণাত ইসলাম গ্রহণ করিলেন, কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত তিনি তাঁহার ইসলাম গোপন রাখিলেন।

তৃতীয় মুসলমান যায়েদ (রাঃ)

নবীজীর গৃহ খাদেম যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)– নবীজী (সঃ) তাঁহাকে পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সদা নবীজীর নিকটেই থাকিতেন। আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পরেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণও নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সত্যতার বিশেষ প্রমাণ ছিল। কারণ স্ত্রীর ন্যায় গৃহভৃত্যের নিকটও আসল রূপ লুক্কায়িত থাকে না।

চতুর্থ মুসলমান আবু বকর (রাঃ)

নবীজীর গৃহবাসী সকলে ঈমান গ্রহণ করিলে পর নবীজী (সঃ) নিজ বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেও ইসলামের প্রচার চালাইলেন, কিন্তু গোপনে গোপনে। এই প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম আবু বকর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

আবু বকরের ইসলাম গ্রহণ নবীজীর (সঃ) সাফল্যের এক বিরাট অধ্যায় ছিল। কারণ ইতিপূর্বে যাঁহারা মুসলমান হইয়াছিলেন তাঁহারা ছিলেন নবীজীরই করতলগত লোকগণ; তদুপরি তাঁহাদের ইসলামের বিশেষ কোন প্রভাব ছিল না। একজন মহিলা, অপরজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, আর একজন ত ক্রীতদাস গৃহভৃত্য। এতদ্ভিন্ন মহিলা ও গৃহভৃত্যের ত বাহিরের সঙ্গে সম্পর্ক কম ছিল, আর আলী (রাঃ) ত তখনও ইসলাম প্রকাশ করিয়াছিলেন না।

এইসব দিক দিয়া আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আবু বকর (রাঃ) বেশী বয়সের ছিলেন, এমনকি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রায় সমবয়স্ক– মাত্র দুই বৎসরের ছোটছিলেন। ধন-জন মান-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক দিয়া গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একজন পরিগণিত ছিলেন এবং সৎ-সাধু সুচরিত্রে স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন।

বিবি খাদীজার ভাইপো হাকীম ইবনে হেযামের নিকট একদা আবু বকর বসিয়াছিলেন; ঐ সময় হাকীমের ক্রীতদাসী আসিয়া বলিল, আপনার ফুফু আম্মা খাদীজা বলেন, তাঁহার স্বামী মূসা (আঃ) পয়গম্বরের ন্যায় পয়গম্বরী লাভ করিয়াছেন। এতদশ্রবণে আবু বকর (রাঃ) তথা হইতে সরিয়া পড়িলেন এবং দৌড়িয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন। নবী (সঃ) তাঁহাকে ইসলামের আহ্বান জানাইলে তিনি তৎক্ষণাত ইসলাম গ্রহণ করিলেন। এইরূপে শুনিবামাত্র বিনাদ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করিয়া নেওয়া ঐ সময় অতি বিরল ও বিচিত্র ছিল; তাই তিনি "সিদ্দীক" –অতিশয় বিশ্বাসী আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

হাদীছে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছিলেন, আমি যেকোন ব্যক্তিকে ইসলামের আহ্বান জানাইয়াছি প্রত্যেকেই কিছু না কিছু দ্বিধা প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু আবু বকর ইসলামের আহ্বান শুনামাত্রই বিনা দ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে।

আবু বকর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে সকলের সম্মুখে তাঁহার ইসলাম প্রকাশ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং নবী (সঃ) হইতে শত্রুদের অত্যাচারও যথাসাধ্য নিবারণ করার চেষ্টায় ব্রতী থাকিতেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণে মক্কায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। তাই তিনি সাধারণ্যে সর্বপ্রথম মুসলমানরূপে প্রসিদ্ধ; তাঁহার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কাহারও ইসলাম সম্পর্কে কেহ কোন খোঁজ রাখিত না।

১৬৭৪। হাদীছ ঃ হাম্মাম (রঃ) বলিয়াছেন, আম্মার (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে প্রথম এরূপ অবস্থায় দেখিয়াছি যে, তাঁহার সঙ্গে মাত্র পাঁচ জন ক্রীতদাস, দুই জন মহিলা আর আবু বকর (রাঃ) ছিলেন। (পৃষ্ঠা-৫১৬)

ব্যাখ্যা ঃ পাঁচ জন ক্রীতদাস হইলেন, যায়েদ, বেলাল, আমের ইবনে ফোহায়রা, আবু ফোকায়হা এবং আম্মার রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম। আর মহিলাদ্বয় হইলেন খাদীজা এবং আম্মারের মাতা- সুমাইয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা।

যায়েদ (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ক্রীতদাস ছিলেন; তাঁহাকে মুক্ত করিয়া নবী (সঃ) স্বীয় পোষ্যপুত্র বানাইয়া ছিলেন। বেলাল (রাঃ) মক্কার এক সর্দার উমাইয়া ইবনে খলফের ক্রীতদাস ছিলেন; ইসলাম গ্রহণের কারণে বেলাল (রাঃ) ভীষণ অত্যাচারিত হইতে ছিলেন, তাই আবু বকর (রাঃ) তাঁহাকে ক্রয় করিয়া মুক্ত করিয়া ছিলেন। আমের (রাঃ) আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ক্রীতদাস ছিলেন। উক্ত সাত জনের দুই জন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পূর্বে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আলী (রাঃ)ও মুসলমান হইয়াছিলেন, কিন্তু গোপনে।

আবু বকর (রাঃ) মুসলমান হইয়া গোপনে গোপনে বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আহ্বানে ওসমান, যোবায়ের, আবদুর রহমান, ইবনে আওফ, তাল্‌হা এবং সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন। আবু বকর (রাঃ) তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইলেন; সকলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। এই পাঁচ জন সকলেই মক্কার বিশিষ্ট শ্রেণীর লোক ছিলেন। (সীরাতে মোস্তফা, ১-১১৯)

এইরূপে ধীরে ধীরে অতি মন্থর গতিতে হইলেও ইসলামের কাজ সম্মুখপানে অগ্রসর হইতে লাগিল। নবীজীর কার্যকলাপ নিতান্তই বিক্ষিপ্ত আকারে চলিতেছিল; যথায় তথায় সুযোগপ্রাপ্তে তিনি গোপনে ইসলাম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। এই সময়ের মধ্যেই অষ্টম বা দশম সংখ্যায় আরকাম (রাঃ) মুসলমান হইলেন; তাঁহার বাড়ী ছিল সাফা পর্বতের পাদদেশে। মুসলমানগণের পরামর্শে স্থির হইল যে, নবী (সঃ) আরকাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহে বসিবেন; মুসলমানগণ লুকাইয়া লুকাইয়া তথায় একত্রিত হইবেন; নবী (সঃ) হইতে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করিবেন, আর সকলে পরামর্শ করিয়া পরিকল্পিতভাবে কাজ চালাইবেন। তখন হইতে নবী (সঃ) "দারে আরকাম" আরকাম রাযিয়াল্লাহু আনহুর গৃহে* নিয়মিত বসিতেন এবং মুসলমানগণ গোপনে তথায় একত্রিত হইতেন; ইসলামের শিক্ষা লাভ করিতেন এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেন।

নবুয়তের তৃতীয় বৎসর- প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার

দীর্ঘ তিন বৎসরকাল ইসলামের কার্যকলাপ মক্কা নগরীর সীমার মধ্যে গোপনে গোপনে চলিল। নবুয়তের তৃতীয় বৎসরের শেষের দিকে পবিত্র কোরআনের দুই সূরার দুইটি আয়াত নাযিল হইল- যাহাতে আল্লাহ

* ১৯৫০ ইং সনের হজ্জে এই গৃহ যেয়ারতের সৌভাগ্য হইয়াছি; এখন গৃহটির স্থান হরম শরীফের আওতায় আসিয়া গিয়াছে- গৃহের চিহ্নও নাই!

তাআলা হযরত (সঃ)-কে প্রকাশ্যে সুস্পষ্টরূপে ইসলামের আহ্বান ব্যাপকভাবে প্রচার করার নির্দেশ দান করিলেন।

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ـ اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ ـ

অর্থ ঃ "বিশ্ববাসীকে যাহা পৌঁছাইবার জন্য আপনাকে আদেশ করা হইয়াছে আপনি তাহা সর্বসমক্ষে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ্যে প্রচার করুন; মোশরেকদের কোন পরোয়া করিবেন না। উপহাসকারীদের মোকাবিলায় আপনার পক্ষে আমিই যথেষ্ট হইব।" (পারা-১৪; রুকু-৬)

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ـ

"আপনি (ইসলামের প্রকাশ্য প্রচার আরম্ভ করিতে যাইয়া প্রথমতঃ) আপনার নিকটতম জ্ঞাতি গোষ্ঠীকে (আল্লাহর আযাব হইতে)। সতর্ক করুন।" (পারা-১৯, রুকু-১৫)

এই নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বিশেষ ব্যবস্থাপনার সহিত স্বীয় আত্মীয় স্বজনসহ মক্কার সকল প্রধানগণকে তওহীদ ও ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইবার চেষ্টায় লাগিয়া গেলেন।

এই উদ্দেশে নিকট আত্মীয়গণকে একত্র করার জন্য একদিন নবীজী (সঃ) নিজ গৃহে দাওয়াতের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি আলী (রাঃ)কে বলিলেন, এক ছা'- প্রায় চারি সের আটা, বকরীর একটি সম্মুখ রান এবং সাধারণ এক পেয়ালা দুধ যোগাড় কর। অতপর আত্মীয় স্বজনসহ কোরায়শদলপতিদিগকে দাওয়াত প্রদান করিলেন। আবু তালেব, হামযা, আব্বাস, আবু লাহাব- হযরতের চাচাগণসহ প্রায় চল্লিশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত দাওয়াতে আসিলেন।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অলৌকিক বরকত ছিল যে, ১০/১২ জনের খাদ্য পরিমাণ ঐ খানা চল্লিশ জন তৃপ্ত হইয়া খাওয়ার পরও অবশিষ্ট থাকিল। অতপর হযরত (সঃ) দুধের পেয়ালা উপস্থিত করিতে বলিলেন; ইহাও তদ্রূপই- সাধারণ এক পেয়ালা দুধ চল্লিশ জনে পরিতৃপ্তির সহিত পান করিলেন। পানাহার শেষে নবীজী (সঃ) নিজের কথা প্রকাশ করিলেন; তাহার পূর্বেই আবু লাহাব বলিয়া উঠিল, হে লোকসকল! মুহাম্মদ ত আজ তোমাদের খাদ্যেও জাদু চালাইয়াছে- এইরূপ জাদু আর দেখি নাই। ইহা বলিতেই সকলে ছুটাছুটি করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল; সেই দিন নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কোন কথাই বলিবার সুযোগ পাইলেন না।

এই দিনের অকৃতকার্যতা নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে দমাইতে পারিল না, তিনি চেষ্টার পর চেষ্টা বারংবার চেষ্টার নীতি অবলম্বন করিলেন।

আর একদিন ঐরূপ দাওয়াতের ব্যবস্থা করিয়া লোকজনকে একত্র করিলেন। আজ পানাহার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নবীজী মোস্তফা (সঃ) তওহীদ ও ইসলামের আহ্বান জানাইয়া বলিলেন, সমবেত ব্যক্তিবৃন্দ! আমি আপনাদের জন্য এমন কল্যাণ ও মঙ্গল লইয়া আসিয়াছি যাহা কোন মানুষ তাহার জাতির জন্য আনয়ন করিতে পারে নাই। আমি আপনাদের জন্য ইহ পরকাল উভয়ের কল্যাণ মঙ্গল লইয়া আসিয়াছি।

(সীরাতে মোস্তফা, ১-১২৮)

কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ ছাড়াই দাওয়াতী সম্মেলন সমাপ্ত হইয়া গেল, সকলে নিজ নিজ পথে চলিয়া গেল। এইরূপে গৃহাভ্যন্তরে সত্যের ডাক শুনাইবার পর নবীজী মোস্তফা (সঃ) নিজ সাধনায় আর এক ধাপ অগ্রসর হইলেন- দেশ ও জাতিকে চরম আহ্বান জানাইবার আরও এক বিশেষ ব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করিলেন।

আরবের প্রথা ছিল, সমাগত কোন ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে দেশ ও জাতিকে সতর্ক করিতে হইলে পর্বত শিখরে উঠিয়া চিৎকার করিতে হইত। সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মঙ্গলবাহক বিপদ নিবারক নবীজী মোস্তফা (সঃ) সেই কায়দায় দেশ ও জাতিকে চিরস্থায়ী জীবনের চিরস্থায়ী আযাব হইতে সতর্কীকরণপূর্বক তওহীদ ও

ইসলামের আহ্বান জানাইলেন। সেমতে একদিন নবীজী (সঃ) প্রভাতে কা'বা শরীফের সম্মুখস্থ সাফা পর্বত শিখরে আরোহণ করিলেন এবং সমগ্র কোরায়শকে বিশেষভাবে নিজ আত্মীয়-স্বজনকে বিপদ সঙ্কেতের ধ্বনি দ্বারা আহ্বান করিলেন। সকলে ছুটিয়া আসিয়া সাফা পর্বত প্রান্তে সমবেত হইল; এমনকি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যে উপস্থিত হইতে সক্ষম হয় নাই সে নিজ প্রতিনিধি পাঠাইল। পর্বত শৃঙ্গ হইতে নবীজী মোস্তফা (সঃ) সকলকে সম্বোধনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যদি সংবাদ দেই যে, এই পর্বতের পিছন হইতে একদা শত্রু সৈন্য তোমাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিবার জন্য আসিতেছে-- তোমরা আমার এই কথা বিশ্বাস করিবে কি? সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, নিশ্চয় করিব; আমরা কখনই তোমাকে কোন মিথ্যার সংস্পর্শে আসিতে দেখি নাই। নবীজী (সঃ) তখন জলদ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, যদি তাহাই হয় তবে শুন! আমি তোমাদিগকে কঠিন আযাব হইতে সতর্ক করিতেছি! অর্থাৎ আমার আহ্বানে সাড়া না দিলে ঐ আযাব তোমাদের উপর আসিবে।

নিম্নে বর্ণিত হাদীছদ্বয়ে এই বিষয়ের বর্ণনা রহিয়াছে।

১৬৭৫। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা-৭০২) عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِيْ يَا بَنِيْ فِهْرٍ يَابَنِيْ عَدِيٍّ لِبُطُوْنِ قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوْا فَجَعَلَ الرَّجُلُ اِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يَّخْرُجَ اَرْسَلَ رَسُوْلاً لِيَنْظُرَ مَا هُوَ فَجَاءَ اَبُوْ لَهَبٍ وَقُرَيْشٍ فَقَالَ اَرَئَيْتَكُمْ لَوْ اَخْبَرْتُكُمْ اَنَّ خَيْلاً بِالْوَادِيْ تُرِيْدُ اَنْ تُغِيْرَ عَلَيْكُمْ كُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ قَالُوْا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ اِلاَّ صِدْقًا قَالَ فَاِنِّى نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىَّ عَذَابٍ شَدِيْدٍ فَقَالَ اَبُوْ لَهَبٍ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا ـ

(فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ـ مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ)

অর্থঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন পবিত্র কোরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হইল, وانذر عشيرتك الاقربين "আপনি আপনার নিকটতম আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করুন"- তখন হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একদা সাফা পর্বতে আরোহণ করিলেন এবং (হে জনমণ্ডলী। সতর্ক হও, সতর্ক হও বলিয়া সকলকে উদ্বুদ্ধ করিলেন এবং *) হে বনী ফেহ্‌র গোত্রীয় লোকগণ! হে বনী আদী গোত্রীয় লোকগণ! এইরূপে কোরায়শ বংশীয় গোত্রসমূহকে ডাকিলেন। তাহারা সকলে তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়া তথায় উপস্থিত হইল, এমনকি কোন কোন গোত্রের সর্দার উপস্থিত হইতে সক্ষম না হওয়ায় তাহার পক্ষের পর্যবেক্ষককে ব্যাপারটা দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। তথায় আবুলাহাবসহ কোরায়শ সর্দারগণ উপস্থিত হইল।

হযরত নবী (সঃ) তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা বল ত! যদি আমি তোমাদিগকে এই ভয়ঙ্কর সংবাদ প্রদান করি যে, একদল শত্রুসেনা নিকটবর্তী উপত্যকা বা গিরিপথ বাহিয়া (আজই সকাল বেলা বা বিকাল বেলা *) তোমাদের উপর আক্রমণ করার উদ্দেশে (এই পাহাড়ের পিছন হইতে)* আসিয়া পড়িতেছে, তবে তোমরা আমাকে সত্য সংবাদদাতা মনে করিবে কি? সর্দারগণ সকলেই একবাক্যে বলিল, হাঁ- কারণ আমরা কখনও আপনার মধ্যে সত্য ছাড়া মিথ্যার লেশমাত্র দেখি নাই। তখন হযরত (সঃ) বলিলেন, (তোমরা যে শেরেক ও বুৎপরস্তির মধ্যে আছ যদি ইহা ত্যাগ না কর তবে কেয়ামত বা পরজীবনে তোমাদের উপর ভীষণ আযাব আসিবে; সেই) ভীষণ আযাব আসিবার পূর্বে আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি। (সেই আযাব হইতে পরিত্রাণ পাইবার ব্যবস্থা তোমাদিগকে বাতাইবার জন্য আমি আসিয়াছি।)

* চিহ্নিত তিনটি বন্ধনীর মধ্যবর্তী বিষয় ৭৪৩ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে।

তখন আবু লাহাব (ক্রোধ স্বরে) বলিল, সর্বদার জন্য তোমার সর্বনাশ হউক– তুমি আমাদিগকে (তোমার ধর্মের) এই কথা শুনাইবার জন্য একত্র করিয়াছ?

আবু লাহাবের উক্তির প্রতিবাদেই এই সূরা নাযিল হয়–

تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ـ

অর্থ ঃ "আবু লাহাবের সমুদয় চেষ্টা-তদবীর ধ্বংস হইয়াছে এবং সে নিজেও ধ্বংস হইয়াছে । তাহার ধন-সম্পদ এবং স্বীয় অর্জিত প্রভাব-প্রতিপত্তি কোনই কাজে আসে নাই। (আল্লাহর আযাব হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই।)

১৬৭৬। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা–৭০২১) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوْا اَنْفُسَكُمْ لاَ اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ لاَاُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسَ ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ اُغْنِىْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ لاَ اُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلِيْنِىْ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِىْ لاَاُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ـ

অর্থঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন আল্লাহ তাআলা وانذر عشيرتك الاقربين আয়াত নাযিল করিলেন তখন রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (উক্ত আয়াতের নির্দেশানুসারে স্বীয় আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করার উদ্দেশে) দণ্ডায়মান হইলেন এবং আত্মীয়বর্গকে সমবেতভাবে আর কতেক জনকে বিশেষরূপে আহ্বান করিলেন– হে (আমার বংশধর) কোরায়েশ বংশীয় লোকগণ! তোমরা নিজদিগকে আল্লাহর আযাব হইতে বাঁচাইতে সচেষ্ট হও; (আযাব হইতে পরিত্রাণের মূল ব্যবস্থা তোমরা গ্রহণ না করিলে) আমি তোমাদিগকে আল্লাহর আযাব হইতে বাঁচাইবার জন্য কোন সাহায্যই করিতে পারিব না।

হে (নিকটতম আত্মীয়বর্গ–) আব্দে মনাফ গোত্রীয় লোকগণ! (তোমরাও আযাব হইতে পরিত্রাণের মূল ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে) আমি তোমাদিগকে আল্লাহর আযাব হইতে বাঁচাই কোন সাহায্যই করিতে পারিব না।

হে আমার চাচা! আব্দুল মোত্তালেবের পুত্র আব্বাস! (আপনিও যদি আযাব হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তবে) আমি আল্লাহর আযাব হইতে বাঁচাইবার জন্য আপনাকেও কোন সাহায্য করিতে পারিব না।

হে আল্লাহর রসূলের ফুফু সূফিয়্যা"! (আযাব হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে) আপনাকেও আমি কোন সাহায্য পৌঁছাইতে পারিব না।

হে মুহাম্মদের (সঃ) কন্যা ফাতেমা! তুমি আমার ধন-সম্পদের যতটুকু ইচ্ছা দাবী করিতে পার, কিন্তু (আযাব হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা স্বয়ং গ্রহণ না করিলে) আমি তোমাকেও আল্লাহর আযাব হইতে বাঁচাইবার জন্য কোন রকম সাহায্য করিতে পারিব না। (অর্থাৎ নাজাত পরিত্রাণের মূল বস্তু ঈমান ও ইসলাম ব্যতিরেকে কাহারও কোন সম্পর্ক, এমনকি নবীর সম্পর্কও কোন কাজে আসিবে না।)

এই হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা এবং আহ্বানও উপস্থিত ক্ষেত্রে কোন ফলদায়ক হইল না। আবু লাহাব এই ক্ষেত্রেও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উদ্দেশ্য বানচাল করার হট্টগোল সৃষ্টি করিয়া দিল সকলেই বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া গেল।

নবীজী মোস্তফার (সঃ) উৎসাহ-উদ্যমের সীমা নাই। ভন্ড ধোকাবাজ লোক আত্মবিশ্বাসহীন দুর্বলচেতা হয়; প্রাথমিক অকৃতকার্যতায় তাহারা বিহ্বল হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে অনাবিল সত্য ও অকৃত্রিম উদ্দেশ্য লইয়া যাহারা কর্তব্যের কারণেই কর্তব্য পালনে অগ্রসর হন তাঁহাদের আত্মবিশ্বাস আত্মবল পর্বত সমতুল্য এবং অকৃতকার্যতার উপর তাঁহারা সাফল্যের কল্যাণ সৌধ নির্মাণে সাধনা করেন। আত্মবিশ্বাসহীন ভণ্ড লোকেরা যেই পরিস্থিতিতে অকৃতকার্যতার প্রথম আঘাতেই মুহ্যমান হইয়া পড়ে, সত্যের সেবকগণ সেই পরিস্থিতে অধিকতর উৎসাহ, অধিকতর সাহস এবং বজ্র কঠিন দৃঢ়তা লইয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকেন। সত্যের মহাসেবক কর্তব্যের মহাসাধক হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাহার পূর্ণতম বাস্তব আদর্শ। দেশ ও জাতির এই উপেক্ষা উদাসীনতায়, আত্মীয়-স্বজনের দুর্ব্যবহারে তিনি একটুও বিচলিত বা ক্ষুব্ধ হইলেন না, বরং তাঁহার উদ্যম-উৎসাহ এবং সাধনার গতি আরও বাড়িয়া গেল। "হয় উদ্দেশের সাধন না হয় জীবনের পাতন" এই আদর্শের চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন নবীজী মোস্তফা (সঃ) এই কঠিন ময়দানে।

দাওয়াত-ব্যবস্থার করুণ আহ্বানে বিফল হইলেন, পর্বতশৃঙ্গের গাম্ভীর্যপূর্ণ সতর্ক বাণীতে অকৃতকার্য হইলেন, কিন্তু নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মনোবল অক্ষুণ্ন, মর্মস্পৃহা অদম্য। এখন তিনি তওহীদ ও ইসলামের বাণী– "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" ঘরে ঘরে পৌঁছাইবার জন্য পথে-প্রান্তরে নামিয়া পড়িলেন।

عن ربيعة بن عباد قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس فى منازلهم يقول ان الله يامركم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وابولهب ورائه يقول يايها الناس ان هذا يامركم ان تتركوا دين ابائكم ـ

অর্থ ঃ "রবিয়া ইবনে আব্বাদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি– রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম লোকদের ঘরে ঘরে ছুটাছুটি করিতেছেন এবং বলিতেছেন, আল্লাহ তোমাদিগকে আদেশ করিতেছেন– তোমরা একমাত্র তাঁহার এবাদত-উপাসনা কর, অন্য কোন কিছুকে তাঁহার সঙ্গী, শরীক, অংশীদার সাব্যস্ত করিও না। নবীজী (সঃ) এই আহ্বান লইয়া বেড়াইতেন আর আবু লাহাব তাঁহার পিছনে পিছনে বলিতে থাকিত– হে লোকসকল! এই লোকটা তোমাদিগকে পরামর্শ দেয় তোমাদের ভাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করিতে; তোমরা সতর্ক থাকিও।"

ইহার উপরও ক্ষান্ত নহে– আবু লাহাব, আবু জহল-গোষ্ঠী তাঁহাকে জাদুকর, গণক-ঠাকুর, মিথ্যাবাদী, পাগল বলিয়া লোকদের নিকট হেয় ও উপেক্ষণীয় সাব্যস্ত করিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকিত। কিন্তু তাহাদের কোন প্রচেষ্টাই নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দৃঢ় মনোবল, অদম্য কর্মস্পৃহাকে তিলমাত্র ক্ষুন্ন করিতে পারিত না। তিনি পথে-প্রান্তে, হাটে-মাঠে, মেলা-উৎসবে সর্বত্র ইসলাম প্রচারে আমদমনীয় হইয়া উঠিল।

মুনীব গামেদী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি বলিতেছিলেন, হে লোকসকল! তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লা গ্রহণ কর; তোমাদের মঙ্গল হইবে। ঐ সময় হতভাগাদের কেহ তাঁহাকে গালি দিতেছিল, কেহ তাঁহার উপর থুথু ফেলিতেছিল, কেহ তাঁহার উপর ধুলা-বালু ছঁড়িতেছিল। এমন অবস্থায় একটি মেয়ে পানি নিয়া আসিয়া নবীজী (সঃ)-এর মুখমণ্ডল ও হাত ধৌত করিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, মেয়েটি নবীজী তনয়া যয়নব (রাঃ)। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মেয়েটিকে বলিলেন, হে বৎস! পিতার দুঃখে ও মানহানিতে ভীত হইও না।

(সীরাতে মোস্তফা, ১–১৪৭)

তারেক ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "জুল মাজায" মেলায় আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি অসাল্লামকে দেখিয়াছি– তিনি বলিয়া যাইতে ছিলেন, হে লোক সকল! তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লা গ্রহণ কর তোমাদের মঙ্গল হইবে! এক হতভাগা তাঁহার পিছনে পিছনে তাঁহার উপর পাথর মারিতে ছিল এবং বলিতে ছিল, এই মিথ্যাবাদীর কথা কেহ শুনিও না। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দেহ মোবারক রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছিল। (ঐ)

আর একজন ছাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন– জুল মাজায মেলায় আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দেখিয়াছি– তিনি বলিয়া যাইতেছিলেন, হে লোকসকল! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু গ্রহণ কর; তোমাদের মঙ্গল হইব। আবু জাহল তাঁহার প্রতি ধুলা-বালু ছুঁড়িতেছিল এবং লোকদিগকে বলিতেছিল, তোমরা তাহার ধোঁকায় পড়িও না; সে তোমাদিগকে তোমাদের দেবদেবী হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চায়। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিতেছিলেন না। (ঐ)

রবিয়া ইবনে আব্বাদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "ওকাজ" এবং 'জুল-মাজায" মেলায় আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দেখিয়াছি– তিনি বলিতেছিলেন, হে লোকসকল! তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু গ্রহণ কর। তোমাদের মঙ্গল হইবে। আর একটা টেরা মানুষ তাঁহার পিছনে পিছনে বলিতেছিল, এই লোকটা বেদ্বীন-মিথ্যাবাদী। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, ঐ টেরা মানুষটা নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চাচা আবু লাহাব। (সীরাতে মোস্তফা, ১–১৩১)

নবুয়তের চতুর্থ বৎসর মোশরেকদের শত্রুতার ঝড়

দীর্ঘ তিন বৎসর ইসলাম প্রচার গোপনে চলিয়া প্রকাশ্যে প্রচার আরম্ভ হইলে পর আবু লাহাব শ্রেণীর কেহ কেহ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিরোধী হইল এবং মক্কার জনসাধারণ পথে-ঘাটে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক ঠেস মারিতে লাগিল বটে, কিন্তু হযরতের আত্মঘাতী শত্রুতায় লিপ্ত হয় নাই।

চতুর্থ বৎসরের শেষ দিকে হযরত (সঃ) মোশরেকদের গর্হিত মাবুদ দেবদেবী ও ঠাকুর প্রতিমাগুলির নিষ্কর্মণ্যতা, অপদার্থতা ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া ঐ সবের প্রতি ঘৃণা ও উপেক্ষা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং এই মর্মে অবতারিত পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতও প্রচার করিতে লাগিলেন। যথা–

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمْ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ ـ لَوْ كَانَ هٰؤُلَاءِ اٰلِهَةً مَا وَرَدُوْهَا ـ وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ

অর্থ ঃ "হে মোশরেকগণ! নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ ভিন্ন তোমাদের গর্তিত পূজ্য দেবদেবীসমূহ সবই জাহান্নামের জ্বালানিতে পরিণত হইবে; তোমরা পূজারী ও পূজ্য উভয়েই নরকে প্রবেশ করিবে। (এখন ভাবিয়া দেখ!) যদি এই গর্হিত পূজ্য দেবদেবীগুলি বাস্তবিকই মাবুদ হইত তবে এইগুলি কখনও জাহান্নামে দগ্ধ হইত না, অথচ ঐ পূজ্য দেবদেবীগুলিসহ তোমাদের সকলেরই জাহান্নামে চিরকাল পতিত থাকিতে হইবে। (পারা–১৭, রুকু–১৭)

এইরূপ আয়াত পবিত্র কোরআনে আরও রহিয়াছে। যথা–

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ـ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ـ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ـ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ـ

অর্থ ঃ "হে লোকসকল! একটি কৌতূহলজনক কথা বর্ণনা করা হইতেছে, তোমরা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর! আল্লাহ ভিন্ন অন্য যেসব দেবদেবী-মূর্তির পূজা-উপাসনা তোমরা করিয়া থাক তাহারা সকলে একত্রিত হইয়া একযোগে চেষ্টা করিলেও কিছুতেই একটি মাত্র মাছিও সৃষ্টি করিতে পারিবে না। আরও শুন– মাছি যদি তাহাদের (ভোগ–ভেট) হইতে কোন বস্তু ছিনাইয়া নিয়া যায় তবে সেই বস্তুটি মাছি হইতে ছাড়াইয়া রাখিবার শক্তিও তাহাদের নাই। উপাসক (মানুষ) ত অক্ষম দুর্বল আছেই, উপাস্য মূর্তিগুলি ত আরও অধিক অক্ষম দুর্বল। এই শ্রেণীর লোকেরা বস্তুতঃ আল্লাহ তথা প্রকৃত উপাস্যের পূর্ণ মর্যাদা বুঝেও নাই, দেয়ও নাই। আল্লাহ ত নিশ্চয় সর্বশক্তিমান সর্বোপরি প্রাধান্যের অধিকারী আছেন। (পারা– ১৭, রুকু–১৭)

আল্লাহ তাআলা আরও বলিয়াছেন–

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ـ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ـ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ ঃ "যাহারা আল্লাহ ভিন্ন পূজ্য সাহায্যকারী অবলম্বন করে তাহাদের অবস্থা মাকড়সার ন্যায়। মাকড়সা নিজের রক্ষার জন্য ঘর তৈয়ার করে, অথচ দুনিয়ার সমস্ত গৃহের মধ্যে সর্বাধিক দুর্বল মাকড়সার গৃহ। (তদ্রূপ যাহারা সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ছাড়িয়া সাহায্যের আশায় দুর্বলদের পূজা করিয়া থাকে! কতই না অযৌক্তিক তাহাদের এই আশা।) যদি তাহাদের জ্ঞান থাকিত! (পারা–২০; রুকু–১৬)

মোশরেকদের ধর্ম এবং তাহাদের ধর্মীয় দেব-দেবীদের এইরূপ নিন্দা-মন্দ বেইজ্জতী অপমানের বহু আয়াত কোরআন শরীফে নাযিল হইতে লাগিল। নবীজী (সঃ) সেইসব আয়াত নির্ভীকভাবে যথারীতি প্রচার করিয়া চলিলেন।

এতদিন কাফেররা নবীজীর প্রতি বেশীর ভাগ বিদ্রূপ, উপহাস, উপেক্ষা, করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেছিল। এখন যখন তিনি তাহাদের পূজ্য দেব-দেবীর নিন্দা-মন্দ ও পৌত্তিলিকতার অসারতা প্রচার করিতে লাগিলেন এবং তাহাদের পূজ্য মহাপুরুষগণসহ তাহাদেরকে নরকী বলিয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলেন তখন কোরায়েশ দলপতিগণ সমবেতভাবে নবীজীকে বাধাদানে ইসলাম প্রচার বন্ধ করিয়া দিতে উদ্যত হইল। এই পর্যায়ে তাহাদের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা হইল– নবীজীর আশ্রয়দাতা বনী হাশেমের সর্দার আবু তালেব দ্বারা এই কাজ সমাধা করা। তাহারা ভাবিল, আবু তালেবের আশ্রয়ে থাকিয়াই মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাহাদের আন্দোলন চাইতে সক্ষম হইতেছে; আবু তালেব আমাদের সর্দার আমাদেরই ধর্মমতের। সুতরাং তিনি তাহাকে বাধা দিলে সহজেই সে ঐসব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। কোরায়শ দলপতিগণ এই উদ্দেশ্য লইয়া আবু তালেবের সহিত পর পর তিন বার বৈঠকে বসিল।

আবু তালেবের সহিত প্রথম বৈঠক

কোরায়েশ দলপতিগণ আবু তালেবের নিকট নবীজী (সঃ) সম্পর্কে অভিযোগ করিল, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের পূজ্য দেব-দেবীর নিন্দা-মন্দ প্রচার করে, আমাদের ধর্মমতকে ভ্রষ্টতা বলে, আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণকে নাদান-আহমক পথভ্রষ্ট নরকী সাব্যস্ত করে। আপনি হয় তাহাকে এইসব কথা ও কাজ না করিতে বাধ্য করুন, না হয় তাহাকে আমাদের জন্য ছাড়িয়া দিন; আমরাই তাহার মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করিব– আপনি মধ্যে পড়িবেন না।

এই দিন আবু তালেব কোরায়শ দলপতিগণকে মোলায়েমভাবে পাঁচ রকম নরম কথায় ঠাণ্ডা করিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। (বেদায়া ৩–৪৭)

আবু তালেবের সহিত দ্বিতীয় বৈঠক

প্রথম বৈঠকে আবু তালেব নরম কথায় কোরায়শ দলপতিগণকেই ঠাণ্ডা করিয়াছিলেন, নবীজীকে কোন কিছু বলেন নাই। নবীজী (সঃ) যথারীতি তাঁহার কার্য চালাইয়া যাইতেছেন। এই অবস্থায় কোরায়শ দলপতিদের উত্তেজনা বাড়িয়া চলিল; তাহারা পুনরায় আবু তালেবের সহিত বৈঠকে মিলিত হইল। তাহারা আবু তালেবকে বলিল, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদিগকে যাতনা দিয়া থাকে– আমাদের সভা-সমাবেশে আমাদের পূজালয়ে মন্দিরে। আপনি তাহাকে আমাদের যাতনা দেওয়া হইতে বারণ করুন। আবু তালেব তৎক্ষণাত তাহার পুত্র আকীলকে বলিলেন, যাও, মুহাম্মদকে ডাকিয়া নিয়া আস। আকীল যাইয়া তাঁহাকে কাহারও কুঁড়ে ঘর হইতে ডাকিয়া আনিল। কোরায়শ দলপতিগণ আবু তালেবের সম্মুখে বসিয়া আছে, দ্বিপ্রহর বেলা, নবীজী (সঃ) ঐ সময়ই তথায় উপস্থিত হইলেন। আবু তালেব নবীজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনার এইসব লোকেরা বলিতেছে, আপনি তাহাদের সভা-সমাবেশে, পূজালয়ে-মন্দিরে তাহাদের যাতনা দিয়া থাকেন; আপনি এইরূপ কাজ হইতে বিরত থাকুন। নবী (সঃ) আকাশপানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা সূর্য দেখেন কি? তাহারা বলিল, হাঁ। নবী (সঃ) বলিলেন, আপনারা এই সূর্য হইতে কিছু অংশ নিয়া আসিতে যে পরিমাণ সক্ষম, আমি আমার কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করিতে তদপেক্ষা বিন্দুমাত্র কম অক্ষম নহি। আবু তালেব নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এরূপ দৃঢ়তাদৃষ্টে তাহাদিগকে বলিলেন, আমার ভ্রাতুষ্পত্র কখনও মিথ্যা বলে না; বাস্তবিকই সে অক্ষম না হইলে কখনও এইরূপ বলিত না; অতএব আপনারা চলিয়া যান। (বেদায়া ১–৪২)

ইতিমধ্যে নবীজী (সঃ) তথা হইতে চলিয়া গেলেন; কোরায়শ দলপতিগণ আবু তালেবের প্রতি ভীষণ ক্ষুব্ধ হইল। তাহারা আবু তালেবকে বলিল, বয়সে, বংশে ও মান-সম্মানে আপনি আমাদের অনেক ঊর্ধ্বে, আমরা চাহিয়াছিলাম। আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পত্রকে বারণ করিবেন; আপনি তাহা করিলেন না– এই বলিয়া তাহারা কঠোর মনোভাব প্রকাশে বলিল, আমাদের পূজ্য দেব-দেবীদের নিন্দা-মন্দ, আমাদের পূর্ব-পুরুষদের বেইজ্জতী–অপমান আমরা কিছুতেই বরদাশত করিব না। আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বারণ করুন, নতুবা তাহার এবং আপনার মোকাবিলায় রক্তারক্তির মাধ্যমে এক পক্ষ নিপাত হইয়া ঝগড়ার অবসান হইবে। এই কথা বলিয়াই কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তাহারা উঠিয়া চলিয়া গেল।

কোরায়শ দলপতিদের ভীতি প্রদর্শনে আবু তালেব বিচলিত হইলেন; সমগ্র দেশ ও জাতির শত্রুতার প্রতিক্রিয়া তাঁহাকে প্রভাবান্বিত করিল। আবু তালেব নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহ অসাল্লামকে ডাকিয়া আনিলেন এবং বলিলেন, দেশের ও বংশের লোকজন আমার নিকট আসিয়াছিল, যাহা তুমিও দেখিয়াছ– তাহারা এই এই বলিয়া গিয়াছে। সুতরাং তুমি নিজের উপরও রহম কর, আমার উপরও রহম কর; তুমি সংযত হও– আমার সাধ্যের অধিক বোঝা আমার উপর চাপাইও না।

আবু তালেবের এই আলাপে নবীজী (সঃ) ধারণা করিলেন, চাচা আবু তালেব বোধহয় আমার সাহায্য-সহায়তা হইতে অব্যাহতি পাইতে চান। তাই নবীজী মোস্তফা (সঃ) তাঁহার দৃঢ়তার আসল রূপ প্রকাশে স্পষ্ট ভাষায় দ্বিধাহীনভাবে বলিলেন– "হে চাচা! মহান আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহারা যদি আমার দক্ষিণ হস্তে সূর্য এবং বাম হস্তে চাঁদ আনিয়া দেয় আর বলে যেন আমি আমার এই কর্তব্য কাজ ত্যাগ করি, আমি আমার কাজ– সত্যের সেবা এক মুহূর্তের জন্যও ক্ষান্ত করিব না। হয় আল্লাহ আমার সাধনাকে জয়যুক্ত করিবেন, না হয় আমি ধ্বংস হইয়া যাইব।" এই কথা বলিয়া নবীজী মোস্তফা (সঃ) কাঁদিয়া দিলেন– তাঁহার অশ্রু বহিতে লাগিল এবং আবু তালেবের সম্মুখ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যখন তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন তখন আবু তালেব তাঁহাকে ডাকিয়া নিকটে আনিলেন এবং বলিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! যাও,

তোমার যাহা ইচ্ছা কর এবং যাহা ইচ্ছা বল। আল্লাহর কসম আমি কোন অবস্থাতেই তোমাকে শত্রুর হাতে ছাড়িয়া দিব না। এই প্রসঙ্গে আবু তালেব একটি পদ্যও রচনা করিয়া সর্বত্র প্রচার করিয়া দিলেন।

وَاللّٰهِ لَنْ يَّصِلُوْا اِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ - حَتّٰى اُوَسَّدَ فِى التُّرَابِ دَفِيْنًا -

আল্লাহর শপথ, বিরুদ্ধবাদীরা সর্বশক্তি ব্যয় করিয়াও আপনার নিকট পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে না; যাবৎ না আমি মাটির নীচে দাফন হইয়া যাই।

فَامْضِ لاَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَةٌ - اَبْشِرْ وَقَرَّ بِذَاكَ مِنْكَ عُيُوْنًا -

অতএব নির্ভীক চিত্তে আপনি আপনার কর্তব্যে অগ্রসর হইতে থাকুন; (আমার এই প্রতিশ্রুতির) সুসংবাদ গ্রহণ করুন এবং চক্ষু শীতল করুন– কোন বাধাই আপনাকে কিছু করিতে পারিবে না।

وَدَعَوْتَنِىْ وَعَلِمْتُ اَنَّكَ نَاصِحِىْ - فَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ قَبْلُ اَمِيْنًا -

আপনি আমাকেও আহ্বান জানাইয়াছেন এবং আমি জানি, আপনি আমার মঙ্গলকামী। নিশ্চয় আপনি সত্য এবং পূর্ব হইতেই আপনি "আমীন" –সত্যবাদী।

وَعَرَضْتَ دِيْنًا قَدْ عَرَفْتُ بِاَنَّهٗ - مِنْ خَيْرِ اَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِيْنًا -

আপনি এক সুন্দর ধর্ম পরিবেশন করিয়াছেন; আমি উপলব্ধি করি, ঐ ধর্ম সকল জাতির ধর্মমত অপেক্ষা উত্তম।

لَوْلاَ الْمَلاَمَةُ اَوْحِذَارُ مَسَبَّةٍ - لَوَجَدْتَنِىْ سَمْحًا بِذَاكَ مُبِيْنًا -

লোকের লানতান ও গালাগালির ভয় যদি আমার না হইত, তবে নিশ্চয় আমাকে দেখিতেন, আমি সরল সুষ্ঠুরূপে এই ধর্মমত গ্রহণ করিয়া নিতাম। (বেদায়া ৩–৪২)

আবু তালেবের সহিত তৃতীয় বৈঠক

মক্কায় আবু তালেবের অসাধারণ প্রভাব ছিল, তাই কোরায়শ দলপতিরা রাগের বশীভূত হইয়া হুমকি-ধমকির কথা বলিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু উহা শুধু তাহাদের অধৈর্য প্রকাশের কথা ছিল, বাস্তবায়িত হওয়ার মত কথা ছিল না। গরমের পর এইবার তাহারা ঠাণ্ডাভাবে আবু তালেবের সহিত তৃতীয় বৈঠকে মিলিত হইল।

এইবার তাহারা ওমারা ইবনে অলীদ নামক এক অতি সুশ্রী সুদর্শন যুবককে সঙ্গে আনিয়া আবু তালেবের নিকট উপস্থিত করতঃ বলিল, এই যুবকটি আপনাকে নিদাবীরূপে দিয়া দিতেছি; তাহার পরিবর্তে আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমাদের হস্তে অর্পণ করিয়া দিন। সে ত আপনার এবং আপনার পূর্বপুরুষদের ধর্মমত বিরোধী আপনার দলের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে এবং আমাদের সকলকে বুদ্ধি-বিবেকহীন বলিয়া প্রচার করিতেছে। আমরা তাহাকে হত্যা করিয়া দেই; আপনার কোন ক্ষতি হইল না– একজনের পরিবর্তে একজনকে আপনি পাইয়া গেলেন।

আবু তালেব বিস্ময়ের সহিত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতঃ বলিলেন, কি অযৌক্তিক বিনিময়! আমার পুত্র তোমাদের হস্তে অর্পণ করিব হত্যার জন্য, আর তোমাদের পুত্রের ব্যয়ভার আমি বহন করিয়া যাইব! খোদার কসম! কস্মিনকালেও ইহা হইবে না। এইবারও কোরায়শ দলপতিগণ উত্তেজনার সহিত নৈরাশ্য নিয়া চলিয়া গেল। (বেদায়া ৩–৪৮)

নবীজীর (সঃ) সহিত কোরায়শদের সরাসরি কথাবার্তা ও প্রলোভন দান

বার বার আবু তালেবের সহিত মিলিত হইয়া ব্যর্থ হওয়ার পর কোরায়শগণ স্বয়ং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সম্মুখে সরাসরি প্রস্তাব পেশ করার উদ্যোগ নিল।

একদা কোরায়েশ দলপতিগণ সন্ধ্যার পর কা'বা শরীফের নিকটে একত্রিত হইয়া স্থির করিল, মুহাম্মদকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) ডাকিয়া আন এবং সরাসরি তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া যুক্তি-তর্কে তাহাকে নিরুত্তর কর, যেন ওজর-আপত্তির কোন অবকাশ তাহার জন্য না থাকে। সেমতে তাহারা নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট লোক পাঠাইয়া এই সংবাদ দিল যে, আপনার বংশীয় মুরব্বীগণ আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য একত্রিত হইয়াছেন।

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাহাদের হেদায়াতের প্রতি অত্যধিক লালায়িত ছিলেন; তিনি ভাবিলেন, হয়ত তাহাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হইয়াছে। এই ভাবিয়া নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দ্রুত তাহাদের বৈঠকে আগমন করিলেন। তাহারা বলিল, আমরা আপনাকে সংবাদ দিয়াছি শেষ কথা শুনিবার জন্য– যাহাতে কোন ওজর-আপত্তির অবকাশ না থাকে। সমগ্র আরবে আপনার ন্যায় কোন মানুষ তাহার জাতির জন্য মাথা ব্যথার কারণ হয় নাই। আপনি নিজের পূর্বপুরুষদের মন্দ বলেন, তাহাদের ধর্মমতের নিন্দা করেন, তাহাদেরকে বিবেক-বুদ্ধিহীন বলেন, তাহাদের পূজ্য দেবদেবীকে গালি দেন– এই করিয়া আপনি আমাদের একতায় ভাঙ্গন সৃষ্টি করিয়াছেন, যত রকম অনাচার এবং বিবাদ-বিরোধ আছে, আপনি আমাদের ও আপনার মধ্যে সেই সবের সৃষ্টি করিয়াছেন।

আপনি যদি এইসব ধন লাভের আশায় করিয়া থাকেন তবে আপনাকে এই পরিমাণ ধন যোগাড় করিয়া দেই যাহাতে আপনি আমাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ধনবান হইয়া যান। আর যদি প্রাধান্যের আশায় এইসব করেন তবে আমরা আপনাকে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্দাররূপে বরণ করিয়া নেই। যদি রাজত্বের আশায় করেন তবে আমরা আপনাকে আমাদের রাজা বানাইয়া নেই। আর যদি জিন-ভুতের তাছিরে আপনার বিকৃতি ঘটিয়া থাকে তবে আমরা সর্বপ্রকার ব্যয় বহনে আপনার চিকিৎসা করি; চিকিৎসা বিফল হইলে আমরা আপনাকে ক্ষমার্হ গণ্য করিব।

রসূলুল্লাহ (সঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আমার সম্পর্কে আপনাদের একটি কথাও সত্য নহে। ধনের বা প্রাধান্যের আশায় রাজত্বের আশায় আ মি কাজ করিতেছি না। আমাকে আল্লাহ তাআলা আপনাদের প্রতি রসূলরূপে পাঠাইয়াছেন এবং কিতাব দান করিতেছেন। তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন, আমি আপনাদের বেহেশতের পথ দেখাইয়া সুসংবাদ দেই এবং দোযখ হইতে সতর্ক করি। সেমতে প্রভুর দেওয়া দায়িত্ব আমি পৌঁছাইতেছি এবং আপনাদের মঙ্গল কামনা করিতেছি। যদি আপনারা আমার কথা, আমার জিনিস গ্রহণ করেন তবে আপনাদের ইহ-পরকালের সৌভাগ্য লাভ হইবে। আর যদি প্রত্যাখ্যান করেন তবে আমি আল্লাহর আদেশ পালনে দৃঢ় ও ধৈর্যধারী হইয়া থাকিব– যাবত না আল্লাহই আপনাদের ও আমার মধ্যে শেষ ফয়সালা করিয়া দেন।

এরপর কোরায়শ দলপতিরা কতগুলি বাহুল্য প্রস্তাব অবতারণা করিল। তাহারা বলিল, আপনি জানেন, আমাদের এই শহরটি অতি সঙ্কীর্ণ, আমাদের জীবনমানও অতি নিম্নের; আমরা গরীব। যেই প্রভু আপনাকে রসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহার নিকট আবেদন করুন, তিনি যেন আমাদের দেশের পাহাড়গুলি হটাইয়া দিয়া আমাদের দেশকে সুপ্রশস্ত করিয়া দেন এবং আমাদের দেশে নদ-নদী প্রবাহের ব্যবস্থা করিয়া দেন যেরূপ সিরিয়া ও ইরাকে রহিয়াছে। আর আমাদের বাপ-দাদা মৃত পূর্বপুরুষদেরকে জীবিত করিয়া দেন– তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিব, আপনার দাবী সত্য কি মিথ্যা।

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উত্তরে এতটুকুই বলিলেন, এইসব উদ্দেশে আমি প্রেরিত হই নাই। যে ধর্মমত প্রদানে আল্লাহ তাআলা আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন আমি তাহা নিয়াই আসিয়াছি; আপনারা তাহা গ্রহণ করিলে দুনিয়া-আখেরাতের মঙ্গল হইবে, আর গ্রহণ না করিলে আমি আল্লাহর আদেশের উপর অটল ধৈর্যশীল হইয়া থাকিব– যাবত না আল্লাহ শেষ ফয়সালা করিয়া দেন।

অতপর তাহারা বলিল, যদি আমাদের জন্য ইহা না করেন তবে আপনি নিজের জন্য এই আবেদন করুন, আপনার প্রভু যেন ফেরেশতা পাঠাইয়া দেন যে আপনার সমর্থন করিবে। আর আপনার জন্য বাগ-বাগিচা, স্বর্ণ-রৌপ্যের অট্টালিকা এবং ধন-দৌলতের ভাণ্ডার দান করেন যেন আপনাকে আমাদের ন্যায় জীবিকা উপার্জনে যাইতে না হয়। আপনার এইসব বৈশিষ্ট্য দেখিলে আমরা বিশ্বাস করিতে পারিব যে, আপনি আল্লাহর রসূল।

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিলেন, আমি প্রভুর নিকট এই আবেদন করিতে পারিব না; প্রভু আমাকে এই জন্য পাঠান নাই। এই সঙ্গে নবীজী (সঃ) আবু তালেবের সহিত দ্বিতীয় বৈঠকে তাঁহার বিঘোষিত পূর্ব উক্তিরও পুনরাবৃত্তি করিলেন।

অতপর তাহারা বলিল, আমরা ত আপনার প্রতি ঈমান আনিব না; আপনি আমাদের উপর আসমান ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করুন। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিলেন, এইরূপ কাজ ত আল্লাহ তাআলার; তিনি যদি ইচ্ছা করেন করিতে পারেন।

এই ধরনের কথাবার্তার পর নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার আশার বিপরীত পরিস্থিতিদৃষ্টে আত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন অবস্থায় গৃহে ফিরিয়া আসিলেন (বেদায়া ৩–৫০)।

এই শ্রেণীর কথোপকথনের আলোচনা পবিত্র কোরআনেও আছে–

وَقَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا ـ اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ـ اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِىَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ قَبِيْلًا ـ اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِى السَّمَاءِ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهٗ ـ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ـ

অর্থ ঃ "কাফেররা বলিল, আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব না, যাবত না আপনি আমাদের জন্য প্রবাহিত করেন আমাদের দেশে নদ-নদী। অথবা আপনার জন্য আঙ্গুর ও খেজুরের বাগান হয়, যাহার মধ্যে নদী-নালা প্রবাহিত থাকে। কিম্বা আপনি আসমান ভাঙ্গিয়া আমাদের উপর ফেলিবার ব্যবস্থা করেন বা আল্লাহ এবং ফেরেশতা আপনার জামিনরূপে নিয়া আসেন, অথবা সোনা-চান্দির ঘর-বাড়ী আপনার হয়, কিম্বা আপনি আসমানে চড়িতে পারেন। অবশ্য আমরা আপনার আসমানে আরোহণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিব না যাবত না আপনি তথা হইতে কোন লিপি নিয়া আসেন; যাহা আমরা পড়িতে পারি। আপনি বলুন, সোবহানাল্লাহ; কি সব আশ্চর্যের কথা! আমি ত মানুষ শ্রেণীর রসূল বৈ নহি!" (পারা–১৫, রুকু–১০)

আর এই শ্রেণীর ফরমায়েশ পূরণ না করা সম্পর্কেও আল্লাহ তাআলার বক্তব্য পবিত্র কোরআনে নিম্নের আয়াতে উল্লেখ রহিয়াছে–

وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ـ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً

فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ـ

অর্থ ঃ "ফরমায়েশী মোজেযা প্রদানে একমাত্র বাধা ইহাই যে, পূর্ববর্তী লোকেরাও এইরূপ ফরমায়েশ করিয়াছিল এবং তাহা পূরণ করার পরও তাহারা সত্য অস্বীকার করিয়াছিল। (ফলে তাহারা ধ্বংস হইয়াছে। যেমন–) সামুদ জাতিকে তাহাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী উষ্ট্রী দিয়াছিলাম, সত্যকে তাহাদের চোখে প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা তাহার সঙ্গেও অন্যায় করিয়াছিল (এবং ধ্বংস হইয়াছিল)। মোজেযা ত আমি শুধু সতর্ক করার উদ্দেশে প্রকাশ করি। (সত্য বুঝিয়া নেওয়া এবং গ্রহণ করা ত জ্ঞান-বিবেকের দ্বারা হইবে।) (পারা– ১৫, রুকু– ৬)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আল্লাহ তাআলার সাধারণ নিয়ম এই যে, তাঁহার রসূলকে যদি কোন নির্ধারিত মোজেযা সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ বা ফরমায়েশ করা হয় এবং আল্লাহ তাআলা রসূলকে সেই মোযেজা প্রদান করেন– এইরূপ ক্ষেত্রে মোজেযা প্রকাশের পরও সত্য অস্বীকার করা হইলে আল্লাহ তাআলার গজব সেই ক্ষেত্রে বিলম্ব করে না; অস্বীকারকারীদেরকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। যেরূপ সামুদ জাতি তাহাদের নবী সালেহ আলাইহিস সালামকে বলিয়াছিল, এই পাহাড় বা বড় পাথরটি হইতে একটি উট বাহির করিয়া দেখাইতে পারিলে আমরা ঈমান গ্রহণ করিব। আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করিয়া সালেহ (আঃ) তাহা করিলেন; তাহাদের চোখের সম্মুখে ঐ পাহাড় বা পাথরটি কম্পমান হইয়া ফাটিয়া গেল এবং তৎক্ষণাত তাহা ইহতে একটি বিরাটাকার উষ্ট্রী বাহির হইয়া আসিল। কাফেররা তাহা জাদু বলিয়া উড়াইয়া দিল; সত্য গ্রহণ করিল না, ফলে সমগ্র জাতি ধ্বংস হইয়া গেল। পবিত্র কোরআনে এই ঘটনা এবং এই শ্রেণীর আরও বহু ঘটনা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

উল্লিখিত আয়াতে এই ইঙ্গিতই দেওয়া হইয়াছে যে, মক্কাবাসীদের ফরমায়েশ পূর্ণ করা হইলে তাহারা এই মুহূর্তে সত্য গ্রহণ করিবে না, সে ক্ষেত্রে তাহারা অবিলম্বে ধ্বংস হইয়া যাইবে। অথচ আল্লাহ তাআলা তাহাদের সময়-সুযোগ দেওয়ার ইচ্ছা রাখেন, তাই তাহাদের ফরমায়েশ পূর্ণ করা হয় নাই; রসূলুল্লাহ (সঃ)ও উদ্যোগ নেন নাই।

হাদীছ শরীফে আছে– মক্কাবাসীরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলিয়াছিলেন, আপনি সাফা পর্বতকে স্বর্ণে পরিণত করুন কিম্বা মক্কার পাহাড়গুলিকে হটাইয়া দিন। (যাহাতে আমরা ক্ষেত-খামার করিতে প্রয়াস পাই। তখন আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলা হইল, ইচ্ছা করিলে আপনি তাহাদের সুযোগ দেওয়ার পথ অবলম্বন করিতে পারেন। আর ইচ্ছা করিলে তাহাদের ফরমায়েশ পূর্ণও করিতে পারেন, কিন্তু সে ক্ষেত্রে তাহারা সত্য অস্বীকার করিলে ধ্বংস হইবে; যেরূপ তাহাদের পূর্বে অনেক জাতি এই কারণে ধ্বংস হইয়াছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছিলেন– না, আমি তাহাদের সুযোগ দেওয়ার পথই চাই। এই প্রসঙ্গেই আয়াত নাযিল হয় وما منعنا (নাসায়ী শরীফ, বেদায়া ৩–৫২)

সরাসরি নবী (সঃ)-কে প্রলুব্ধ করার প্রয়াস

কোরায়শ দলপতিদের উল্লিখিত আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর তাহারা আর একটি উদ্যোগ নিল যে, নবীজীর (সঃ) বাড়ী যাইয়া সরাসরি প্রলোভনমূলক প্রস্তাব দানে তাঁহাকে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করা হউক। সেমতে একদা তাহারা সকলে পরামর্শে বসিল এবং সিদ্ধান্ত নিল যে, আমাদের মধ্যে সর্বাধিক বাকপটু, চতুর, পন্ডিত শ্রেণীর এক ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হউক, সে যাইয়া ঐ লোকটার সহিত কথা বলিবে যে, সে আমাদের ঐক্য বিনষ্ট করিয়াছে আর আমাদের ধর্মকে মন্দ বলে! সেমতে রবিয়ার পুত্র ওতবাকে তাহারা এই কাজের

জন্য নির্বাচন করিল। ওতবা নবীজীর নিকট যাইয়া বলিল, আপনি একটি কথার উত্তর দিন– আপনি উত্তম, না আপনার পিতা আবদুল্লাহ উত্তম ছিলেন? আপনি উত্তম, না আপনার দাদা আবদুল মোত্তালেব উত্তম ছিলেন? নবীজী (সঃ) এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। ওতবা বলিল, যদি তাঁহারা উত্তম ছিলেন তবে তাঁহারা ত এইসব দেব-দেবীরই সেবাইত ছিলেন, যাহাদের নিন্দা-মন্দ আপনি করিয়া থাকেন। আর যদি আপনি নিজেকে উত্তম মনে করেন তবে সেই কথা স্পষ্ট বলুন। আপনার ন্যায় এমন পুত্র দেখি নাই, যে নিজ বংশের দুর্ভাগ্যের কারণ হয়; আপনি আমাদের ঐক্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাদের পূজনীয়দের নিন্দা-মন্দ করেন। আপনি সমগ্র আরবে আমাদেরকে লজ্জিত করিয়াছেন; সর্বত্র বলা হয়, কোরায়শদের মধ্যে একজন যাদুকর হইয়াছে, কেহ বলে পাগল হইয়াছে ইত্যাদি।

অতপর ওতবা তাহার আসল কথা প্রকাশ করিল– সে নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে লোভ-লালসার ফাঁদে ফেলিবার অপচেষ্টা করিল। ধন, প্রাধান্য ও রাজত্ব– এই সর্বোচ্চ লোভের বস্তু যাহার প্রস্তাব কোরায়শ দলপতিগণ নবীজীর সম্মুখে প্রকাশ্য বৈঠকে দিয়া দিল– ওতবা সেই প্রস্তাবই (private pushing) সরাসরি পেশ করিল এবং তদুপরি একটি চতুর্থ বস্তুরও লোভ দেখাইল।

প্রবাদে বলা হয়, كل اناء يترشح بما فيه "প্রত্যেক পাত্র হইতে ঐ বস্তুরই ফোঁটা নির্গত হয় যাহা তাহার মধ্যে থাকে।" ওতবা তাহার নিজ শ্রেণীর লোকদের প্রলোভন দেখাইবার ন্যায় অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে ইহাও বলিল যে, আপনার যদি কামিনী-কাঞ্চনের মোহ থাকিয়া থাকে তবে বলুন, কোরায়শদের মধ্যে যেকোন রূপসী আপনি পছন্দ করিবেন, দশ জন চাহিলে তাহাও সংগ্রহ করিয়া আপনার সাথে বিবাহ দিয়া দেওয়া হইবে।

নবীজী মোস্তফা (সঃ) গম্ভীর স্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার বক্তব্য শেষ হইয়াছে? ওতবা বলিল, হাঁ। নবীজী (সঃ) জ্ঞাত ছিলেন, ওতবা আরবের একজন সুপণ্ডিত ও কবি ব্যক্তি; সে কোরআনের মাধুর্য লালিত্য অনুধাবন করিতে পারিবে। তাই নবী (সঃ) তাহার অশোভনীয় প্রলোভন প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ না হইয়া পবিত্র কোরআনের সুদীর্ঘ অংশ তেলাওয়াত করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। ২৪ পারা সূরা হা-মীম-সাজদার প্রথম ১৩টি আয়াত তেলাওয়াত করিলেন। উক্ত আয়াতসমূহে পবিত্র কোরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং তাহার প্রতি লোকদের বিরোধিতার বিবরণ দানে নবীজীর কর্তব্য-কর্মের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে যে– বলিয়া দিন, আমি তোমাদেরই ন্যায় মানুষ শ্রেণীর, কিন্তু আমার নিকট আল্লাহর ওহী আসে। তোমাদের উপাস্য ও পূজ্য শুধুমাত্র এক আল্লাহ; অতএব তোমরা সকলে একরোখাভাবে তাঁহারই প্রতি নিজ নিজ লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও। ভীষণ দুর্ভাগ্য ও আযাব ঐ লোকদের জন্য, যাহারা আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে, যাহারা আত্মশুদ্ধি করে না এবং পরকাল অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে যাহারা ঈমান গ্রহণ পূর্বক নেক আমল করিবে তাহাদের জন্য অফুরন্ত প্রতিদান ও সুফল রহিয়াছে। অতপর সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতের বর্ণনা রহিয়াছে যে, তিনি আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্ররাজি পয়দা করিয়াছেন– সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহর সঙ্গে কুফুরী-শেরেকী করার উপর বিস্ময় প্রকাশ করা হইয়াছে। অতপর সতর্ক করণে বলা হইয়াছে– যদি তাহারা আপনার কথা গ্রহণ না করে তবে বলিয়া দিন, আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি ঐরূপ আসমানী আযাব হইতে, যে আযাব "আ'দ" ও "সামুদ" জাতিকে ধ্বংস করিয়াছিল।

নবীজীর ধারণা সত্য হইল– পবিত্র কোরআনের মাধুরী মাদকের ন্যায় ওতবাকে মত্ত করিয়া ফেলিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, একমাত্র এই মহাতত্ত্বই আপনার উদ্দেশ্য, অন্য আর কোন উদ্দেশ্য নাই? নবীজী (সঃ) বলিলেন, না। তখন সে সোজা কোরায়শ দলপতিদের নিকট চলিয়া গেল। ওতবার উপর পবিত্র কোরআনের প্রতিক্রিয়া এরূপ পড়িয়াছিল যে, তাহারা তাহাকে দেখামাত্র বলিয়া উঠিল হায়! ওতবা ত পূর্বের ওতবা নাই;

সে ত ধর্মত্যাগী (মুসলিম) হইয়া গিয়াছে! ওতবা তাহাদের নিকট বর্ণনা দিল, আমি তাঁহার সুমধুর কালাম শুনিয়াছি, খোদার কসম আমি ঐরূপ বস্তু আর শুনি নাই। তাহা কবিতাও নহে, জাদু নহে, মন্ত্রও নহে– তাহা এক অতুলনীয় জিনিস। হে আমার জাতি! তোমরা আমার পরামর্শ গ্রহণ কর; তোমরা মুহাম্মদকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁহার অবস্থার উপর স্বাধীন ছাড়িয়া দাও। খোদার কসম তাঁহার মুখে যে কালাম বা বাণী শুনিয়াছি, অচিরেই তাহা বিশ্বব্যাপী মহাআলোড়ন সৃষ্টিকারী হইবে। তোমরা তাঁহাকে তাঁহার কাজে স্বাধীন ছাড়িয়া দেওয়ার পর যদি আরবের অন্য লোকেরা তাঁহার দফা-রফা করিয়া দেঁয় তবে তোমরা নিস্তার পাইলে, আর যদি তিনি সমগ্র আরবের উপর জয়ী হন তবে তাঁহার সম্মান তোমার সম্মান, তাঁহাদের বিজয় তোমাদের বিজয়; কারণ, তিনি তোমাদের বংশীয়। কোরায়েশরা ওতবার এই উক্তি শুনিয়া বলিতে লাগিল, হায় ওতবা! তোমার উপর ত মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) জাদু ক্রিয়া করিয়া ফেলিয়াছে। ওতবা বলিল, আমার যাহা বলিবার বলিয়াছি; তোমাদের যাহা করার ইচ্ছা হয় করিতে পার।

(সীরাতে মোস্তফা, ১--১৩৭)।

ইহুদীদের সহিত কোরায়শদের যোগাযোগ

সব দিকে ব্যর্থতায় কোরায়শরা বিচলিত হইয়া পড়িল; এইবার তাহারা সত্য-অসত্যের খোঁজ লাগাইবার উদ্যোগ গ্রহণ করিল। তাঁহাদের দুই ব্যক্তিকে ইহুদী আলেমদের নিকট মদীনায় পাঠাইয়া দিল; তাহাদের নিকট নবীগণের অনেক ইতিহাস রহিয়াছে। তাহারা ইহুদী আলেমদের নিকট নবীজীর বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাঁহার সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা সকল বৃত্তান্ত শ্রবণে বলিল, তাহার নিকট তিনটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে, যদি তিনি ঐসবের উত্তর দিতে সক্ষম হন তবে বাস্তবিকই তিনি রসূল। নতুবা মিথ্যা দাবীদার। চিন্তা করিয়া তোমরা তাহার সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে– (১) অতীত যুগের কতিপয় যুবক যাহারা তাহাদের দেশ ও রাজশক্তির বিরুদ্ধে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান লইয়া আত্মগোপন করিয়াছিল (যাহাদের আসহাবে কাহফ বলা হয়), তাহাদের বাস্তব ও মূল্যবান ইতিহাস আছে; সেই ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিবে। (২) অতীতে এমন একজন বাদশাহ ছিলেন যিনি দুনিয়ার সমগ্র বসতি এলাকা পর্যটন করিয়াছিলেন, (যাহাকে জুলকারনাইন বলা হয়), তাহারও ইতিহাস আছে– সেই ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিবে।

(৩) রূহ বা আত্মা কি জিনিস তাহাও জিজ্ঞাসা করিবে। এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হইলে প্রমাণ হইবে, বাস্তবিকই তিনি আল্লাহর রসূল; তোমরা তাঁহার কথা গ্রহণ করিবে। আর উত্তর দানে সক্ষম না হইলে মিথ্যা দাবীদার প্রমাণিত হইবে; তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় তাহার সঙ্গে তাহাই করিবে।

ব্যক্তিদ্বয় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়া কোরায়শদের নিকট বলিল, সত্য-মিথ্যার বিচারের বিষয়বস্তু নিয়া আসিয়াছি– এই বলিয়া বিস্তারিত বিবরণ তাহাদের সম্মুখে প্রদান করিল। কোরায়শ দলপতিগণ ছুটাছুটি করিয়া নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল এবং উক্ত তিন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল।

নবীজী (সঃ) একটু বেখেয়ালীর সহিত বলিয়া ফেলিলেন, আগামীকল্য তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিব। এইরূপ ক্ষেত্রে "ইনশাআল্লাহ– যদি আল্লাহ তওফীক দেন" বলা প্রয়োজন, সেই ব্যাপারে নবীজীর ত্রুটি হইয়া গেল। আল্লাহ তাআলা তাহার পরিণতি হইতে নবীজী (সঃ)-কে রেহাই দিলেন না; ওহীর আগমন বন্ধ রহিল। নবীজীর আশা ছিল জিব্রীল (আঃ) আসিলেই কাফেরদের প্রশ্ন জ্ঞাত করিবেন বা এমনিতেই সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে ওহী আসিয়া যাইবে এবং সব অবগত হইয়া তাহাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিবেন। তাই তিনি বলিয়াছিলেন, আগামীকল্য তোমাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়া দিব। কিন্তু "ইনশাআল্লাহ" না বলার কারণে দীর্ঘ পনর বা আঠার দিন জিব্রীলের আগমন স্থগিত রহিল। আগামীকল্যের স্থলে যতই দিন কাটিতে লাগিল কাফেরদের জয়ঢাক পিটানো ততই বাড়িয়া চলিল যে, মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

অসাল্লাম) বলিয়াছিলেন, আগামীকল্যই আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিবেন; অথচ দীর্ঘ দিন চলিল তিনি উত্তর দানে সক্ষম হইলেন না। নবীজীও অত্যন্ত বিচলিত ও চিন্তিত হইলেন; এক দিকে ওহীর আগমন বন্ধ হওয়া অপর দিকে কাফেরদের ঢাক-ঢোল পিটাইয়া দুর্নাম ছাড়ানো। পনর বা আঠার দিনের ভোর বেলা হইতে ঐ অবস্থা চরম আকার ধারণ করিল; ঠিক ঐ দিনই সূরা কাহফের সুদীর্ঘ বর্ণনা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের ঘটনাদ্বয়ের বিবরণে নাযিল হইল। তাহার মধ্যে নবীজী (সঃ)-কে সর্বদার জন্য সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল–

وَلاَ تَقُوْلَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ ـ

অর্থ ঃ "কস্মিনকালেও কোন বিষয় সম্পর্কে এই কথা "ইনশাআল্লাহ" ব্যতীত বলিবেন না যে, আমি আগামীকল্য এই কাজ করিব; যদি ভুল হইয়া যায় তবে যথাসত্বর স্মরণ করিয়া নিবেন আপনার প্রভুকে।"

এই সূরার মধ্যে বর্ণিত আসহাবে কাহফের ঘটনা এবং বাদশাহ জুলকারনাইনের ঘটনা সুদীর্ঘরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে ১৫ পারা ১০ রুকুর প্রথম আয়াতটি নাযিল হইল–

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ـ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً ـ

অর্থ ঃ "তাহারা আপনাকে রূহ বা আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে * আপনি উত্তরে বলুন, রূহ আমার প্রভুর আদেশে সৃষ্ট একটি বস্তু। অর্থাৎ material উপাদান ছাড়া শুধু আল্লাহ তাআলার "কুন হইয়া যাও" আদেশে সৃষ্টি। (যেহেতু রূহ উপাদান ছাড়া সৃষ্ট বস্তু, তাই উহা তোমাদের অথবা কোন মানুষের বোধগম্য হইবে না) তোমাদিগকে অতি ক্ষুদ্র বিন্দুবৎ জ্ঞান দান করা হইয়াছে।" (ঐ শ্রেণীর বস্তুর বুঝ তাহার নাগালের বাহিরে।)

প্রশ্নত্রয়ের উত্তর পাইয়া সত্য উপলব্ধি করার সুযোগ তাহাদের হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের পলীদ– অপবিত্র অন্তর সেই পথে অগ্রসর হইল না; তাহারা বিকল্প পথ আবিষ্কারের চেষ্টা করিল।

আপোস প্রচেষ্টা

কোরায়শ দলপতিগণ এই পর্যায়ে একটা আপোস মিমাংসার প্রস্তাবও নবী (সঃ)-এর নিকট পেশ করিল। তাহাদের প্রস্তাব ছিল এই যে, আমাদের উভয় পক্ষ একে অন্যের ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে হইবে। সেমতে আমরা এক বৎসর আপনার খোদার উপাসনা করিয়া নিব; বিনিময়ে আপনি আমাদের দেব-দেবীদের উপাসনা এক বৎসর করিবেন– এইভাবে বৎসরের পর বৎসর চলিতে থাকিবে। এই প্রস্তাব বাতিল ও প্রত্যাখ্যান করার জন্য কোরআনের সূরা "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফেরুন" নাযিল হয়; যাহার মর্ম এই –

আপনি বলিয়া দিন, হে কাফেরের দল! আমি উপাসনা করি না যাহাদের উপাসনা তোমরা কর; তোমরাও বন্দেগী কর না যাহার বন্দেগী আমি করি। (আমার ও তোমাদের মধ্যকার এই ব্যবধান চিরস্থায়ী; সংমিশ্রণের আপোস সুদূরপরাহতই নহে শুধু, অসম্ভবও বটে) তোমাদের উপাস্যদের উপাসনা আমি করিব আমার উপাস্যের উপাসনা তোমরা করিবে– এই পরিকল্পনা কখনও বাস্তবতার মুখ দেখিবে না। (হাঁ এখনকার মত আপোস এই হইতে পারে যে) তোমরা ত তোমাদের ধর্মে স্বাধীন আছ; আমিও আমার ধর্মে স্বাধীন থাকিব। (আমি তোমাদের বাধা দিব না, তোমরাও আমাকে বাধা দিবে না।)

নির্যাতনের তুফান আরম্ভ হইয়া গেল

মক্কাবাসীরা নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে দমাইবার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হইল; এই ব্যর্থতা তাহাদের

* মদীনাতে স্বয়ং ইহুদীরাও নবী (সঃ)-কে রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছিল। তাহাদের উত্তর দানেও নবী (সঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করিয়াছিলেন। (বেদায়া ৩–৫৬)

বেসামাল করিয়া তুলিল। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের গোত্রীয় প্রভাব এবং আবু তালেবের ন্যায় ব্যক্তির আশ্রয় বাহ্যিকরূপে এক সুকঠিন বাধা ছিল তাঁহার জীবন সংহার ব্যবস্থা গ্রহণে। তাই অগ্নিমূর্তি দস্যুদল লেলিহান হইয়া উঠিল নবীজীর শিষ্য ও ভক্তদের প্রতি; বিশেষতঃ যাহারা ছিলেন দুর্বল। দস্যুরা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, মুসলমানদিগকে নানা অত্যাচারে জর্জরিত করিয়া ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করিতে হইবে। এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না; পুরাদমে চলিল অত্যাচার, উৎপীড়ন ও নির্যাতন– যাহাতে অনেকে জীবন হারাইলেন। কোরায়শরা মুসলেমদের প্রতি কিরূপ অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্তে তাহা উপলব্ধি করা পাঠকের জন্য সহজ হইবে।

সাইয়্যেদুনা বেলাল রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহু

তিনি ছিলেন আফ্রিকার কালা মানুষ; মক্কার সর্দার এবং ইসলামের অন্যতম শত্রু উমাইয়ার ক্রীতদাস। সাইয়্যেদুনা বেলাল (রাঃ) ইসলামের জন্য অমানুষিক অত্যাচার ভোগে এবং সর্বপ্রকার উৎপীড়নের মধ্যে দৃঢ় পদ থাকায় যে ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা নজিরবিহীন। বেলালের মালিক নরাধম উমাইয়া যখন শুনিতে পাইল, তাহারই গৃহে তাহার দাস মুসলমান হইয়াছে তখন সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিল। বেলালকে ডাকিয়া সম্মুখে আনিল এবং চাবুক লইয়া ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল। চাবুকের আঘাতে আঘাতে বেলাল রক্তাক্ত হইয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে 'আহাদ আহাদ– মাবুদ এক, মাবুদ এক' এই শব্দ ছাড়া আর কিছু নহে। বেলালের অনমনীয় ভাব দেখিয়া উমাইয়ার আরও ক্রোধ হইল– এত বড় স্পর্ধা! অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিল। দুপুর বেলা আরবের অগ্নিময় উত্তপ্ত প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত পাথরের উপর উন্মুক্ত আকাশতলে বেলালকে চিতভাবে শোয়াইয়া দেওয়া হইত এবং বুকের উপর ভারী পাথর চাপা দিয়া দেওয়া হইত যেন পার্শ্ব পরিবর্তন করিতে না পারে।

কোন সময় তাপদগ্ধ মরু-বালুকার উপর ঐরূপ অবস্থা করা হইত। এই অবস্থায় বেলালকে বলা হইত, বাঁচিতে চাহিলে মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) ধর্ম ত্যাগ কর, কিন্তু বেলালের মুখে একই শব্দ আহাদ আহাদ।

কোন সময় গরুর কাঁচা চামড়ায় লেপটাইয়া, কোন সময় লৌহবর্ম পরাইয়া অগ্নিবৎ রোদ্রে ফেলিয়া রাখা হইত; সর্বাবস্থায় বেলালের একই জপনা– আহাদ, আহাদ। এই শ্রেণীর লোমহর্ষক অত্যাচারেও যখন বেলালের জপে পরিবর্তন আসিল না তখন পাষণ্ড উমাইয়া এক অদ্ভুত শাস্তির ব্যবস্থা করিল। নিকৃষ্ট পশুর ন্যায় বেলালের গলায় দড়ি বাঁধিয়া বা নাকের ভিতর ছিদ্র করতঃ তাহাতে রজ্জু দিয়া তাঁহাকে দুষ্ট ছেলেদের হাতে অর্পণ করিত। ঐ নিষ্ঠুরেরা বেলালের রজ্জু ধরিয়া টানিতে টানিতে মক্কার পথে হৈ হৈ রবে তামাশা করিয়া বেড়াইত এবং টানিয়া হেঁচ্ড়াইয়া মারিয়া পিটিয়া আধমরা অবস্থায় সন্ধ্যাবেলা বেলালকে উমাইয়ার বাড়ী দিয়া আসিত। রাত্রি বেলায় বেলাল যখন সারা দিনের ক্ষুধার যন্ত্রণায় অবসন্ন, তখন তাঁহকে এক সঙ্কীর্ণ নির্জন প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া চাবুক মারা হইত এবং বলা হইত, এখনও ইসলাম ত্যাগ কর, কিন্তু বেলাল অনড় অটল।

কি দৃশ্য! ক্ষুধার তাড়নায় প্রাণ বাহির হইতে উদ্যত, বেত্রাঘাতে দেহ জর্জরিত, রক্তঝরায় সর্বাঙ্গ সিক্ত কিন্তু নরাধম উমাইয়ার কোন উদ্দেশ্যই সফল হয় না; বেলাল তাঁহার ধৈর্য, দৃঢ়তা ও বিশ্বাসে পর্বত সদৃশ্য, তাঁহার মুখে একই ঘোষণা– আহাদ, আহাদ, আহাদ।

সাইয়্যেদুনা বেলাল (রাঃ) অগ্নি পরীক্ষায় চরম সাফল্য লাভ করিলেন; আল্লাহ তাআলার করুণা তাঁহার জন্য নামিয়া আসিল। একদা আবু বকর (রাঃ) চলার পথে বেলালের মর্মান্তিক দুদর্শা দেখিয়া দারুণ মর্মাহত হইলেন। তিনি পাষণ্ড উমাইয়াকে বলিলেন, এই গরীবকে আর কত অত্যাচার করিবে? তোর কি খোদার ভয়

হয় না? উমাইয়া বলিল, তোমরাই ত তাহাকে খারাপ করিয়াছ; এখন তোমরাই তাহাকে ছাড়াইয়া নাও। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ভাল কথা– আমার একটি ক্রীতদাস আছে তোমাদের ধর্মমতের এবং খুব শক্তিশালী; তাহার সঙ্গে বিনিময় করিয়া নাও। উমাইয়া সম্মত হইল, আবু বকর (রাঃ) এইরূপে সুাইয়্যেদুনা বেলাল (রাঃ)-কে ছাড়াইয়া আনিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন। সাইয়্যেদুনা বেলাল (রাঃ) মুসলমানদের নিকট এতই সম্মানিত ছিলেন যে, খলীফা ওমর (রাঃ) বলিয়া থাকিতেন, আবু বকর (রাঃ) আমাদের সর্দার ও মহান– তিনি আমাদের আর এক সর্দার ও মহানকে মুক্ত করিয়াছেন। (সীরাতে মোস্তফা ১–১৬০)

খাব্বার (রাঃ)

ইসলামের জন্য অগ্নি পরীক্ষার আর এক শিকার হযরত খাব্বাব (রাঃ)। উম্মে আনমার নামক এক দুরাত্মা নারীর ক্রীতদাস ছিলেন তিনি। সেই হতভাগিনী তাঁহাকে সর্বদা অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট করিত। একদা জ্বলন্ত অঙ্গার বিছাইয়া তাহার উপর তাঁহাকে শোয়াইয়া দেওয়া হইল, আর এক পাষণ্ড তাঁহার বুকের উপর পা দিয়া চাপিয়া রাখিল। খাব্বাবের গায়ের চর্বি বিগলিত হইয়া সেই অগ্নি অঙ্গার নির্বাপিত হইল। খাব্বাব (রাঃ) বাঁচিয়া থাকিলেন, কিন্তু তাঁহার পিঠে ধবন কুষ্ঠের ন্যায় ঐ দাহের চিহ্ন বসিয়া ছিল।

অনেক সময় তাঁহাকে লৌহবর্ম পরাইয়া অগ্নিবৎ উত্তাপে ফেলিয়া রাখা হইত। কোন সময় উলঙ্গ শরীরে উত্তপ্ত বালুর উপর শোয়াইয়া রাখা হইত; চামড়ার নীচের চর্বি বিগলিত হইয়া চামড়া বিদীর্ণ হইত এবং বিগলিত চর্বি বাহিয়া পড়িত। তাঁহার কোমরে ঐরূপ জখমের বহু চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। খলীফা ওমর (রাঃ) একদা তাঁহার অত্যাচারিত হওয়ার চিহ্ন দেখিতে চাহিলেন, তিনি তাঁহাকে নিজ কোমরের ঐ চিহ্নসমূহ দেখাইয়া ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহার মালিক পাষণ্ডনীর অন্তরও হয়ত নরম হইতে বাধ্য হইল, সে তাঁহাকে মুক্তি দিয়া দিল।

আম্মার পরিবার

ইসলামের জন্য অকথ্য অত্যাচার ভোগের আর এক শিকার আম্মার (রাঃ) এবং তাঁহার মাতা-পিতা। তাঁহার পিতার নাম "ইয়াসির", অন্য দেশের বাসিন্দা; ইয়াসির মক্কায় আসিয়া আবু হোযায়ফা নামক ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করেন এবং তথায় বসবাস করেন। আবু হোযায়ফার একটি দাসী ছিল "সুমাইয়া"। ঐ দাসীকে সে ইয়াসিরের নিকট বিবাহ দিয়া দেয়; তাঁহার গর্ভে আম্মার জন্ম লাভ করেন; এই সূত্রে আম্মার (রাঃ) আবু হোযায়ফার দাস পরিগণিত হন, কিন্তু সে তাহাকে মুক্তি দিয়া দেয়।

আম্মার (রাঃ) এবং তাঁহার মাতা-পিতা সকলেই মক্কায় অতিশয় দুর্বল ও নিম্নশ্রেণীর পরিগণিত ছিলেন। তাঁহারা তিন জনই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং প্রত্যেকেই ভীষণভাবে অত্যাচারিত হন; এমনকি সেই অত্যাচারেই প্রথমতঃ ইয়াসির (রাঃ) ইন্তেকাল করেন। অতপর একদা মাতা সুমাইয়্যা (রাঃ)-কে অগ্নিবৎ রৌদ্রে দাঁড় করিয়া শাস্তি দেওয়া হইতেছিল, নর পিশাচ আবু জাহল ঐ পথে যাইতেছিল; সেই পাষণ্ড পিশাচ সুমাইয়্যা (রাঃ)-কে তাঁহার লজ্জাস্থানে বর্ষাঘাত করে; তথায় তিনি শাহাদত বরণ করেন। অনেকের মতে ইসলামের পথে সর্বপ্রথম যাঁহার রক্তে যমীন রঞ্জিত হয় তিনি ছিলেন সুমাইয়া (রাঃ)। ইসলামের পথে পিতা এবং মাতা উভয়েই দুনিয়া ত্যাগ করিলেন। আম্মার (রাঃ) বাঁচিয়া আছেন; তাঁহার উপর অস্বাভাবিক অত্যাচার চলিল। তাঁহাকেও উত্তপ্ত বালুর উপর শোয়াইয়া রাখা হইত; কোন সময় জ্বলন্ত অঙ্গার বিছাইয়া তাহার উপর শোয়ানো হইত। একদা এই অবস্থায় নবী (সঃ) তাঁহার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। নবীজী মোস্তফা (সঃ) স্বীয় মোবারক হস্ত তাঁহার মাথায় বুলাইলেন এবং দোয়া করিলেন– "হে আগুন! আম্মারের জন্য শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা হইয়া যাও; যেরূপ ইব্রাহীমের জন্য হইয়াছিলে।" (আলাইহিস সালাম।)।

আম্মার (রাঃ)-কে তাঁহার পিতা-মাতাসহ একত্রে শাস্তি ভোগরত অবস্থায় কোন কোন সময় নবীজী (সঃ) নিচ চোখে দেখিতেন। নবীজী (সঃ) ঐ অবস্থায় তাঁহাদিগকে বলিতেন, হে ইয়াসির পরিবার! সবর কর, ধৈর্য ধর। কোন সময় দোয়া করিতেন– হে আল্লাহ! ইয়াসির-পরিবারের মাগফেরাত করিয়া দাও। কোন সময় নবীজী (সঃ) তাঁহাদের সৌভাগ্য চরমে পৌছাইয়া বলিতেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর; বেহেশত তোমাদের আকাঙ্ক্ষায় রহিয়াছে। (সীরাতে মোস্তফা, ১–১৬২)

আবু ফোকায়হাই ইয়াসার (রাঃ)

সাইয়্যেদুনা বেলালের অত্যাচারী মনিব পাষণ্ড উমাইয়ারই পুত্র সাফওয়ানের ক্রীতদাস ছিলেন আবু ফোকায়হা (রাঃ)। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে পাষণ্ড উমাইয়া তাঁহার পায়ে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া-হেঁচড়াইয়া নির্যাতন করিত। কোন সময় পায়ে লোহার বেড়ী লাগাইয়া উত্তপ্ত বালুর উপর অধঃমুখী শোয়াইয়া রাখিত। একদিন দুরাত্মা উমাইয়া তাঁহাকে ঊর্ধ্বমুখী শোয়াইয়া তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিল; ঐ সময় পাপিষ্ঠ উমাইয়ার ভ্রাতা আর এক নরাধম উবাই আসিয়া বলিল, আরও শক্ত ও কঠিনভাবে তাহার গলা টিপিয়া ধর। পাপিষ্ঠ উমাইয়া তাহাই করিল । এমনকি সকলেই ভাবিল, আবু ফোকায়হার জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়া পাপিষ্ঠরা তথা হইতে চলিয়া গেল; তিনি সচেতন হইলেন এবং সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

আবু বকর (রাঃ) একদা তাঁহার চরম দুদর্শা দেখিয়া মর্মাহত হইলেন এবং তাঁহাকে ক্রয় করিয়া নিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন। (সীরাতে মোস্তফা, ১–১৬৪)

যনীরাহ রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহা

তিনি ক্রীতদাসী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাঁহার উপরও অমানুষিক অত্যাচার হইতে লাগিল। অসহনীয় অত্যাচারের ফলে তাঁহার চক্ষুদ্বয় বিনষ্ট হইয়া গেল; পাষণ্ডরা বলিতে লাগিলে, আমাদের দেবী "লাত" ও "ওজ্জা" তাহাকে অন্ধ করিয়া দিয়াছে। তিনি বলিলেন, লাত ও ওজ্জা ত এরূপ অপদার্থ যে, তাহাদের পূজারী সম্পর্কেও তাহাদের কোন খবর নাই। আমার যাহা হইয়াছে আল্লাহর আদেশে হইয়াছে; আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করিলে আমার চক্ষু ভালও হইয়া যাতে পারে। সত্য সত্যই ঐদিন ভোর বেলা নিদ্রা হইতে উঠিলে তাঁহার চক্ষুদ্বয় সম্পূর্ণ ভাল ছিল। তাঁহাকেও আবু বকর (রাঃ) ক্রয় করিয়া মুক্তি দান করিয়াছিলেন। (সীরাতে মোস্তফা ১–১৬৫)

এতদ্ভিন্ন নাহ্দিয়াহ এবং তাঁহার কন্যা লবীনা, মুআম্মেলিয়াহ উম্মে আব্স– তাঁহারা সকলেই ক্রীতদাসী ছিলেন এবং মুসলমান হওয়ার অপরাধে অত্যাচারের যাঁতাকলে পিষ্ট হইতেছিলেন। আবু বকর (রাঃ) একে একে প্রত্যেককেই ক্রয় করিয়া মুক্তি দান করতঃ নির্যাতন হইতে বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পুরুষদের মধ্যে বেলাল, আবু ফোকায়হা এবং আমের ইবনে ফোহায়রা– তাঁহারাও ক্রীতদাস ছিলেন; মুসলমান হওয়ার অপরাধে অত্যাচারে নিষ্পেষিত হইতেছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেককে আবু বকর (রাঃ) ক্রয় করিয়া মুক্তিদানে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। (সীরাতে মোস্তফা,–১৬৬)

দুনিয়ার কোন লাভ বা স্বার্থ ছাড়া শুধু নিপীড়িত মুসলমানকে উদ্ধারকরণে আবু বকর (রাঃ) তাঁহার ধন এইরূপ অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন। নবী (সঃ) তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন, "আমার উপর জান-মালের সর্বাধিক উপকার যাঁহার রহিয়াছে, তিনি হইলেন আবু বকর।" (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

১৬৭৭। হাদীছ ঃ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ خَبَّابًا يَقُوْلُ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَقَدْ لَقِيْنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ شِدَّةً فَقُلْتُ اَلاَ تَدْعُوْ اللّٰهَ فَقَعَدَ وَهُوَ مُحَمَّرٌ وَجْهُهُ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمَشَاطِ الْحَدِيْدِ مَادُوْنَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ اَوْعَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ عَنْ دِيْنِهِ وَيُوْضَعُ الْمِيْشَارُ عَلٰى مَفْرِقِ رَاْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَلَيُتِمَّنَّ اللّٰهُ هٰذَا الْاَمْرَ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ اِلٰى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ اِلاَّ اللّٰهَ وَالذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهِ۔ (وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ)*

অর্থ ঃ খাব্বাব (রাঃ)* বর্ণনা করিয়াছেন, (যখন আমরা মুষ্টিমেয় ইসলাম গ্রহণকারী দুর্বল লোক মোশরেকদের জুলুম-অত্যাচারের স্টীম-রোলারে নিষ্পেষিত হইতেছিলাম তখনকার ঘটনা–) একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কা'বা গৃহের ছায়ার স্বীয় চাদরখানা মাথার নীচে দিয়া শোয়া অবস্থায় ছিলেন, তখন আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম (আমরা ত কাফেরদের অত্যাচারে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছি), আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, সাহায্য তলব করুন। এতদশ্রবণে হযরত (সঃ) শোয়াবস্থা হইতে উঠিয়া বসিলেন এবং (রাগের দরুন) তাঁহার চেহারা মোবারক রক্তবর্ণ হইয়া গেল। অতপর তিনি বলিলেন, তোমাদের পূর্বেও ঈমান ও ইসলামের জন্য মানুষকে বহু কষ্ট-যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছে– এক একজন মানুষকে দ্বীন ও ঈমান হইতে ফিরাইবার জন্য লোহার চিরুনি দ্বারা শরীরের মাংস ও হাড়ের উপরের মাংসপেশী পর্যন্ত আঁচড়াইয়া ফেলা হইত; এত কষ্ট-যাতনাও তাহাকে দ্বীন-ঈমান হইতে ফিরাইতে পারিত না এবং (যমীনের মধ্যে পা গাড়িয়া) করাত দ্বারা মাথা হইতে চিরিয়া তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলা হইত, তাহাও তাহাকে দ্বীন-ঈমান হইতে ফিরাইতে পরিত না– সব কিছু সহ্য করত দ্বীন-ঈমান আঁকড়াইয়া থাকিত।

(তোমরা ধৈর্য ধর, দ্বীন-ইসলামের এই অবস্থা থাকিবে না,) নিশ্চয় নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা দ্বীন-ইসলামকে অতিশয় শক্তিশালী করিবেন, সারা বিশ্বে ইহার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এমনকি একা একজন মুসলমান ইয়ামান দেশের সানা এলাকা হইতে সুদূর হাজ্‌রামাউত পর্যন্ত একা একা সফর করিতে পারিবে; এক আল্লাহ ভিন্ন বন-জঙ্গলের বাঘ-ভল্লুক ছাড়া কোন মানুষের ভয় তাহাকে করিতে হইবে না। (দ্বীন ইসলামের এইরূপ প্রভাব-প্রতিপত্তি, শক্তি ও শান্তির দিন নিশ্চয় আসিবে, অবশ্য তাহা একটু সময়সাপেক্ষ।) কিন্তু তোমরা ঐ অবস্থা অতি তাড়াতাড়ি চাহিতেছ (যাহা বাঞ্ছনীয় নহে– তোমাদিগকে সময়ের অপেক্ষায় ধৈর্যধারণ করিতে হইবে)

পরীক্ষার ফল

হেনা বা মেহেদি পাতা দুলালীর হাতকে কত সুন্দর রং দেয়; পিষিত না হইয়া কি সেই পাতা ঐ রং দিতে পারে? رنگ لاتی هے حنا پس جانے کے بعد "পিষিত হওয়ার পরেই হেনার রং বিকশিত হয়।" ইসলামের অপূর্ব প্রাণশক্তিও ঠিক তদ্রূপই। ইসলামের জন্য নিষ্পেষণের মাত্রা যতই বাড়িতে থাকে, ভিতর হইতে খাঁটি ইসলামের শক্তি ততই প্রকাশ পাইতে থাকে। ইতিহাসে এইরূপ একটি নজিরও পেশ করিতে

* বন্ধনীর মধ্যবর্তী বাক্যটি ৫১০ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে।

* খাব্বাব (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী প্রাথমিক ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম একজন ছিলেন। তিনিও বেলাল রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ন্যায় কাফেরদের অমানুষিক অত্যাচারে নিষ্পেষিত হইয়াও দ্বীন-ইসলামকে আঁকড়াইয়া ছিলেন। পূর্ণ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

পারিবে না যে, ঐ সকল অমানুষিক উৎপীড়ন-নির্যাতনে মুসলমান একটি প্রাণীও ইসলাম হইতে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হইয়াছিল। দুরাচার বিধর্মীরা তাহাদের পাশবিকতা প্রকাশে শক্তির সর্বশেষ বিন্দু ব্যয় করিত; আর ইসলামের অনুরক্ত ভক্তগণ আত্মত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা এবং অসাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত ইসলামের গৌরব ও মহিমা অকাতরে প্রকাশ করিয়া যাইতেন। كذالك الايمان اذا خالط بشاشته القلوب "ঈমান ও ইসলামের আভা যখন অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া যায় তখন তাহার স্থিরতা, দৃঢ়তা ও অটলতা এইরূপ পর্বত সদৃশই হইয়া থাকে।" (৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।)

সম্ভ্রান্তগণের উপরও অত্যাচার

বলাবাহুল্য, শুধু নিঃস্ব দরিদ্র দুর্বল মুসলমানদের উপরই অত্যাচার-উৎপীড়ন সীমাবদ্ধ ছিল না। দেশজোড়া যখন মুসলমানদের উপর অত্যাচারের ঝড় সৃষ্টি হইল এবং অত্যাচারীরা উগ্র হইয়া পড়িল, তখন উত্তেজনার মুখে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও কোন কোন ঘটনায় অমানুষিক অত্যাচারের কবলে পতিত হইলেন।

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একটি ঘটনা– মুসলমানদের সংখ্যা চল্লিশে পৌঁছিতেছে– এই সময় আবু বকর (রাঃ) অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন, ইসলামের আহ্বান প্রকাশ্যে চালাইবার। নবী (সঃ) প্রথমে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু আবু বকরের পীড়-পীড়িতে পরে তাহা মঞ্জুর করিলেন। এমনকি সকল মুসলমানসহ হরম শরীফের মসজিদে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রকাশ্য ভাষণ দানে আবু বকর (রাঃ) দণ্ডয়মান হইলেন। একজন মুসলমানের পক্ষ হইতে ইসলামের সাধারণ বক্তৃতা সর্বপ্রথম উহাই। বক্তৃতা শুধু আরম্ভই হইয়া ছিল, তৎক্ষণাত কাফের-মোশরেক দল চতুর্দিক হইতে মুসলমানদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। আবু বকর (রাঃ) বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু উত্তেজনার মুখে তিনিও রেহাই পাইলেন না– তাঁহার উপরও ভীষণ প্রহার পড়িল। বেদম প্রহারে তাঁহার মুখমণ্ডল পর্যন্ত এরূপ জখম ও রক্তাক্ত হইল যে, তাঁহাকে চেনা যাইত না, তিনি বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার বংশের লোকেরা সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিল এবং অচৈতন্য অবস্থায় তাঁহাকে উঠাইয়া বাড়ী নিয়া যাওয়া হইল। কাহারও আশা ছিল না যে, তিনি এত আঘাতে বাঁচিতে পারিবেন; তাই তাঁহার বংশের লোকেরা ঘোষণা দিল, যদি আবু বকরের মৃত্যু হইয়া যায় তবে প্রতিশোধে আমরা রবিয়া পুত্র ওতবাকে খুন করিব, কারণ আবু বকর (রাঃ)-কে প্রহারে সেই সর্বাগ্রে ছিল।

আবু বকর (রাঃ) সারা দিন অচেতন অবস্থায় রহিলেন, এমনকি শত ডাকিলেও উত্তর পাওয়া যাইত না। সন্ধ্যার দিকে ডাক দেওয়া হইলে তিনি কথা বলিলেন; চেতনা লাভের পর তাঁহার সর্বপ্রথম কথা ছিল, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কি অবস্থা?

এই কথায় বংশের লোকেরা ভীষণ দুঃখিত ও বিরক্ত হইল যে, যাহার সঙ্গে থাকায় এত বিপদ, এই মুহূর্তে আবার তাহার নাম! বিরক্ত হইয়া সকলে তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গেল; তাঁহার মাতাকে বলিয়া গেল যে, তাঁহাকে কিছু খাওয়াইবার ব্যবস্থা করুন। তাঁহার মাতা কিছু খাদ্য তৈয়ার করিয়া আনিলে তিনি মাতাকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অবস্থা কি? বিরক্তির সহিত মাতা বলিল, আমি তাহা কি জানি?

উম্মে জমীল নাম্মী এক মুসলমান মহিলা ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কথা সাধারণভাবে গোপন রাখিয়াছিলেন। আবু বকর (রাঃ) তাঁহার ইসলাম জ্ঞাত ছিলেন, তাই তিনি আশা করিলেন, ঐ মহিলা নবীজীর (সঃ) সংবাদ নিশ্চয় জ্ঞাত থাকিবেন। সেমতে আবু বকর (রাঃ) তাঁহার মাতাকে বলিলেন, আপনি উম্মে জমীলের নিকট যাইয়া নবীজীর অবস্থা জ্ঞাত হইয়া আসুন, তারপরে আমি খানা খাইব। মা তাহাই করিলেন, কিন্তু তিনি উম্মে জমীলের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নবীজীকে চিনেন বলিয়াও স্বীকার

করিলেন না। তবে তিনি বলিলেন, তোমার পুত্রের সংবাদে মনে খুব ব্যথা লাগিয়াছে; চল আমি তাহাকে দেখিয়া আসিব। উম্মে জমীল (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে দেখিয়া কাঁদিয়া দিলেন। আবু বকর (রাঃ) তাঁহাকে নবীজীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি গোপনে আবু বকরের মাতার ভয় প্রকাশ করিলেন। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তাঁহার কোন ভয় করিও না, তখন উম্মে জমীল বলিলেন, নবীজী (সঃ) অক্ষত ও সুস্থ আছেন। আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি এখন কোথায় আছেন? উম্মে জমীল বলিলেন, তিনি এখন আরকামের গৃহে আছেন। তখন আবু বকর (রাঃ) কসম করিয়া বলিলেন– যাবত নবীজী (সঃ)-কে দুই নয়নে না দেখিব তাবত কোন পানাহার গ্রহণ করিব না।

এই অবস্থায় আবু বকর (রাঃ) পানাহার গ্রহণ করিবেন না– ইহা কি মায়ের প্রাণ মানিয়া লইতে পারে? রজনী যখন গভীর হইয়া আসিল; লোকজনের চলাচল বন্ধ হইয়া গেল, তখন মা আবু বকর (রাঃ)কে গোপনে আরকামের গৃহে পৌছাইলেন। নবীজী (সঃ)-কে পাইয়া আবু বকর (রাঃ) তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন; নবীজী (সঃ)ও আবু বকর (রাঃ)-কে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিলেন। উপস্থিত মুসলমানগণও আবু বকর (রাঃ)-কে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; কারণ তাঁহার অবস্থা দেখাও অসহনীয় ছিল।

আবু বকর (রাঃ) ঐ সময় স্বীয় মাতার ইসলামের জন্য নবীজীর (সঃ) নিকট দোয়ার দরখাস্ত করিলেন। নবীজী (সঃ) দোয়া করিলেন এবং তাঁহাকে ইসলামের আহ্বান জানাইলেন; তৎক্ষণাত তিনি মুসলমান হইয়া গেলেন। (হেকায়াতে ছাহাবা–৩০৩)

এতদ্ভিন্ন অভিজাত সম্ভ্রান্তদের কেহ মুসলমান হইলে তিনি দুর্বলদের ন্যায় যত্রতত্র সকলের যথেচ্ছ দুর্ব্যবহারের শিকার না হইলেও নিজ বংশীয় লোকদের এবং আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা অবশ্যই উৎপীড়িত হইতেন।

ওসমান (রাঃ) মক্কার একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ও সম্পদশালী লোক ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলে তাঁহার বংশীয় লোকেরা তাঁহার উপর ক্ষেপিয়া উঠিল; তাঁহার পিতৃব্য হস্তপদ বাঁধিয়া তাঁহাকে নির্মমভাবে প্রহার করিত। তাহাদের অত্যাচারে তিনি বাধ্য হইয়া সস্ত্রীক দেশত্যাগ করতঃ আবিসিনিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

নরাধম নরপিশাচরা মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার করিতে করিতে এতই উগ্র ও উন্মাদ হইয়া পড়িল যে, স্বয়ং নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবনেও নানারূপ কষ্ট-যাতনার সৃষ্টি করিতে লাগিল। হযরতের ঘরে-দুয়ারে মরা-পচা, গান্ধা-গলিজ বস্তু ফেলিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিত। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ১–২০১)।

পথে-ঘাটে হযরতের মাথার উপর ধুলা-বালু ছুঁড়িয়া মারিত, তাঁহার উপর আঘাত করিত উৎপীড়ন-উত্ত্যক্ত করিতেও কুণ্ঠিত হইত না।

প্রথম খণ্ডের ১৭০ নং হাদীছে তাহাদের ঐরূপ একটি জঘন্য ঘটনার বিবরণ রহিয়াছে। নিম্নের হাদীছটিও তাহার নমুনা

১৬৭৮। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা–৫১৯) عن عروة بن الزبير قال سَاَلْتُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاص اَخْبَرْنِىْ بِاَشَدّ شَئ صَنَعَه الْمُشْرِكُوْنَ بِالنَّبِىّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فِىْ حِجْرِالْكَعْبَة اِذْ اَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ اَبِىْ مُعَيْطٍ فَوَضَعَ ثَوْبَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ فَخَنَقَهٗ خَنْقًا شَدِيْدًا فَاَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى اَخَذَ بِمَنْكِبَيْهِ وَدَفَعَهٗ عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ -

অর্থ ঃ ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম ছাহাবী) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-কে আমি বলিলাম, মক্কার মোশরেকরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপর যে অমানুষিক জুলুম-অত্যাচার করিয়াছে তাহা হইতে একটা জঘন্যতম ঘটনা শুনান ত।

তিনি বলিলেন, একদা নবী (সঃ) বায়তুল্লাহ শরীফের হাতীমে নামায পড়িতে ছিলেন। হঠাৎ ওকবা ইবনে আবী মো'আইত তথায় আসিয়া তাহার কাপড় হযরতের গলায় জড়াইয়া ভীষণভাবে চিপা দিল।

আবু বকর (রাঃ) দৌড়াইয়া আসিলেন এবং ওকবার কাঁধে ধাক্কা দিয়া নবী (সঃ) হইতে হটাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, তোমরা একটি লোককে এই জন্য মারিয়া ফেলিতে চাও যে, তিনি বলেন, আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার আল্লাহ; অথচ তিনি তাঁহার দাবীর পক্ষে তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে কত কত উজ্জ্বল প্রমাণ পেশ করিয়াছেন?

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ছাহাবীদের উপর মোশকেরদের তরফ হইতে যেসব লোমহর্ষক জুলুম-অত্যাচার হইয়াছিল তাহা ইসলামের ইতিহাসে রক্তাক্ষরে বর্ণিত রহিয়াছে। এ স্থলে ঐ সবের নমুনা উল্লেখ করিলেও তাহাতেই বড় বই হইয়া যাইবে। মোটকথা নবুয়তের চতুর্থ বৎসর হইতে ঐ সব জুলুম-অত্যাচার আরম্ভ হয় এবং ক্রমান্বয়ে বিভীষিকাময় আকার ধারণ করিতে থাকে।

আবু তালেব কর্তৃক হযরত (সঃ)-কে রক্ষা করার ভার গ্রহণ

মুসলমানদের ঐতিহাসিক দুর্দিনে কয়েকজন মুসলমান ছিলেন বেলাল (রাঃ) ও সোহায়েব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ন্যায় ক্রীতদাস শ্রেণীর। তাঁহাদের উপর ত জুলুম-অত্যাচারের কোন সীমাই ছিল না, যাহারা মুক্ত কিন্তু কাফেরদের বৃহৎ শক্তির সম্মুখে দুর্বল তাঁহাদের উপরও অত্যাচার হইত, কিন্তু তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি গোত্রীয় রক্ষাব্যূহ কিছুটা সহায়কের কাজ করিত। বিশেষতঃ হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পক্ষে ঐরূপ সহায়তার উসিলা আল্লাহ তাআলার বিশেষ কুদরতই ছিল।

হযরতের পিতার স্থলে তাঁহার লালন-পালনের ভার বহনকারী দাদা আবদুল মোত্তালেবের মৃত্যুও হযরতের শৈশবকালে হইয়া যায়। তৎপর হযরতের চাচা আবু তালেব তাঁহার লালন-পালনের ভার লইয়াছিলেন। আট বৎসর বয়স হইতে হযরতের ন্যায় চরিত্রবান ছেলের লালন-পালনকারী আবু তালেবের অন্তর হযরতের মায়া-মহব্বত, স্নেহ-মমতায় পরিপূর্ণ ছিল এবং দীর্ঘ দিনের এই স্নেহ-মমতার চাপ তাঁহার অন্তরে এমনভাবে পাকা-পোক্তা হইয়া গিয়াছিল যে, কোন পরিস্থিতিতেই তিনি তাহাতে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না।

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই দুর্দিনে আবু তালেবের সেই অকৃত্রিম স্নেহ মমতাকে আল্লাহ তাআলা হযরতের জন্য বাহ্যিক রক্ষাব্যূহ বানাইয়া দিলেন। তখন আবু তালেব মক্কার মধ্যে একজন অন্যতম শক্তিশালী ও প্রভাবশালী সর্দার পরিগণিত ছিলেন। তাঁহার ইশারার উপর কোরায়শ বংশীয় বৃহত্তম দুইটি গোত্র বনু হাশেম ও বনু মোত্তালেবের প্রতিটি মানুষ জীবন দানে দাঁড়াইয়া যাইত। সেই আবু তালেব হযরতের রক্ষণাবেক্ষণে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। এই বিষয়টি মক্কার মোশরেকদের পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা ব্যক্তিগতভাবে এবং একাধিকবার প্রতিনিধিত্বমূলকরূপে আবু তালেবের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া তাঁহাকে বারণ করার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল।

মোশরেকেরা হযরতের বিরুদ্ধে যতই ষড়যন্ত্র আঁটিল, আবু তালেব ততই হযরতের সাহায্যে দৃঢ়তা অবলম্বন করিলেন; এমনকি শেষ পর্যন্ত আবু তালেব মক্কাবাসীদের মোকাবিলায় স্বীয় শক্তি দৃঢ়তর করার জন্য বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবের সকলকে একত্রিত করিয়া হযরতের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিতে উদ্বুদ্ধ করিলেন। সকলেই তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিল এবং সমবেতভাবে সর্বাবস্থায় হযরতকে সাহায্য করার ঘোষণা জারি করিয়া দিল।

নবুয়তের পঞ্চম বৎসর আবিসিনিয়া বা হাবশায় হিজরত (পৃষ্ঠা-৫৪৬)

মক্কার প্রভাবশালী দুইটি গ্রোত্র বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবের শক্তি ও সমর্থনে পুষ্ট আবু তালেবের সাহায্য-সহায়তার দরুন হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে মোশরেকগণ ইচ্ছানুরূপ জুলুম-অত্যাচার করিতে কিছুটা বাধার সম্মুখীন হইয়া ছাহাবীগণের উপর তাহাদের সমুদয় ঝাল মিটাইবার উন্মাদনায় মত্ত হইয়া পড়িল। তাহাদের উপর এমনভাবে অত্যাচার বহাইয়া দিল যে, ইহা সহ্য করিয়া নেওয়া কোন প্রাণীর পক্ষেই সাধ্যকর ছিল না।

তদুপরি বড় কষ্ট মুসলমানদের এই ছিল যে, তাঁহারা সকলে এবাদত-বন্দেগী আদায় করার সুযোগ পাইতেন না, কোরআন পাঠ করিতে পারিতেন না! দৈহিক নির্যাতন অপেক্ষা এই নির্যাতন মুসলমানদের পক্ষে অধিক বেদনাদায়ক ছিল।

এতদ্দৃষ্টে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ছাহাবীগণকে বলিলেন, যাহার ইচ্ছা হয় জীবন বাঁচাইয়া স্বীয় দ্বীন-ঈমান রক্ষার জন্য আবিসিনিয়ায় চলিয়া যাইতে পার। তথাকার শাসনকর্তা একজন সুপ্রকৃতির লোক, সে কাহারও উপর কোন জুলুম-অত্যাচার করে না। নবুয়তের পঞ্চম বৎসর রজব মাসে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এই অনুমতি প্রদান করেন, সেমতে ছাহাবীগণের মধ্য হইতে ১২ জন আবিসিনিয়ায় হিজরত করিলেন। তন্মধ্যে মাত্র ৪ জন নিজের সঙ্গে স্ত্রীকেও লইয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ৮ জন স্ত্রী-পুত্র সর্বস্ব ত্যাগ করতঃ নিসঙ্গরূপেই হিজরত করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ মত অনুসারে মোট ১৬ জনের একটি দল মক্কা ত্যাগ করতঃ আবিসিনিয়ার দিকে রওয়ানা হন। তাঁহারা হইলেন- (১) ওসমান গনী (রাঃ), (২) এবং তাঁহার স্ত্রী হযরতের কন্যা রুকাইয়্যাহ্ (রাঃ), (৩) আবু হোযায়ফা (রাঃ), (৪) এবং তাঁহার স্ত্রী সাহ্‌লা বিনতে সোহায়ল (রাঃ), (৫) আবু সালামা (রাঃ), (৬) এবং তাঁহার স্ত্রী উম্মে সালামা (রাঃ), (৭) আমের ইবনে রবিয়া (রাঃ), (৮) এবং তাঁহার স্ত্রী লায়লা (রাঃ), (৯) সোহায়ল (রাঃ), (১) আবু সোবরা (রাঃ), হাতেব ইবনে আমর (রাঃ), (১২) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ), (১৩) আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ), (১৪) যোবায়ের (রাঃ), (১৫) মোসআ'ব ইবনে ওমায়ের (১৬) এবং দলপতি ওসমান ইবনে মযউ'ন (রাঃ)।

এই দলটিই ছিল এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম আল্লাহর জন্য এবং দ্বীন ও ঈমানের জন্য স্বীয় দেশ-খেশ সর্বস্ব ত্যাগকারী। দ্বীন ইসলামের জন্য তাঁহারা জন্মভূমি, ঘর-বাড়ী আত্মীয়-স্বরণের মায়া ত্যাগে দেশান্তরিত হইতে বাধ্য হইলেন। নরপিশাচরা জানিতে পারিলে এই কাজেও বাধার সৃষ্টি করিবে, তাই তাঁহারা গোপনে মক্কা হইতে পদব্রজে বাহির হইয়া পড়েন এবং (লোহিত সাগরের কিনারায় পৌঁছিয়া) বাণিজ্যিক নৌকায় আরোহণ করেন। মক্কার কাফেররা সংবাদ পাইয়া তাঁহাদিগকে পাকড়াও করিবার জন্য পিছনে ধাওয়া করে; কিন্তু তাহাদের পৌঁছিবার পূর্বেই নৌকা ছাড়িয়া যায়। (যোরকানী, ১-২৭১)

মক্কাবাসীদের মুসলমান হইয়া যাওয়ার গুজব

মুসলমানগণ আবিসিনিয়ায় পৌঁছিলেন, হযরতের বাক্য অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হইল- তাঁহারা তথায় পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করিলেন। ইতিমধ্যে মক্কায় একটি ঘটনা ঘটিল- "একদা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি অসাল্লাম সূরা 'নজ্‌ম' তেলাওয়াত করিলেন, তাহাতে সেজদার আয়াত আছে; তিনি এবং তাঁহার সঙ্গে উপস্থিত মুসলমানগণ সেজদা করিলেন, তথায় উপস্থিত মোশরেকরাও সেজদায় পড়িয়া গেল।" ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ ১ম খণ্ড ৫৬৯ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

মুসলমানদের সঙ্গে মোশরেকরাও সেজদা করার এই সংবাদটি চতুর্দিকে এই আকারে ছড়াইয়া পড়িল যে, মক্কাবাসী মোশরেকগণ মুসলমান হইয়া গিয়াছে, এমনকি এই খবর আবিসিনিয়ায়ও পৌছিয়া গেল। মুসলমানগণ তথায় রজব মাসে পৌছিয়াছিলেন। রমযান মাসে সেজদার ঘটনা ঘটিয়াছিল। (তব্‌কাতে ইবনে সা'দ ১-২০৬) শওয়াল মাসেই কিছু সংখ্যক মুসলমান আবিসিনিয়া হইতে মক্কাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মক্কার নিকটে পৌছিলে পর তাঁহারা মূল বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং ইহাও জানিতে পারিলেন যে, বর্তমানে মক্কায় জুলুম-অত্যাচারের ঝড় অধিক বেগে বহিতেছে। তখন কয়েকজন ত পুনঃ আবিসিনিয়ায় চলিয়া আসিলেন এবং কয়েকজন মক্কায় আসিয়া কাহারও আশ্রয়ে রহিলেন। (আসাহ্‌হুস্ সিয়ার-৮৮)

মক্কায় মুসলমানদের উপর বিশেষতঃ যাহারা আবিসিনিয়া হইতে ফিরিয়া আসিলেন তাঁহাদের উপর ভয়াবহ জুলুম-অত্যাচার চলিতে লাগিল। অবস্থাদৃষ্টে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পুনরায় ছাহাবীগণকে আবিসিনিয়ায় চলিয়া যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। ছাহাবীগণ দ্বিতীয় বার গোপনে গোপনে আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া যাইতে লাগিলেন। এই বার দলবদ্ধভাবে না যাইয়া ভিন্ন ভিন্ন গেলেন। সর্বপ্রথম আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ভ্রাতা জা'ফর (রাঃ) গিয়াছিলেন।

নবুয়তের ষষ্ঠ বৎসর- মুসলমানদের পক্ষে কতিপয় শুভ লক্ষণ

"কষ্টের সঙ্গে মিষ্ট লাভ" ইহা নির্ধারিত সাধারণ নিয়ম। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন- إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا নিশ্চয় কষ্টের সঙ্গে মিষ্ট আছে, দুঃখের সঙ্গে সুখ আছে, দুর্ভোগের সঙ্গে মঙ্গল আছে। নিশ্চয় কষ্টের সঙ্গে মিষ্ট আছে.......।

মুসলমানদের পক্ষেও এই নীতির উদয় হইল। মক্কার দুরাচাররা মুসলমানদের দমাইবার ও ধর্মান্তর করার জন্য অত্যাচারের শেষ সীমা ছাড়াইয়া গেল, কিন্তু মুসলমানগণ বিন্দুমাত্র দমিলেন না। দ্বীন-ঈমানের জন্য যথাসর্বস্ব ত্যাগে দেশান্তরিত হইতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হইলেন না। ভীষণতম দুর্ভোগও তাঁহাদের সত্য সাধনার অগ্রাভিযানে বাধার সৃষ্টি করিতে পারিল না। প্রতি মুহূর্তে তাঁহারা নূতন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিয়া দ্বীন-ঈমানে পর্বত অপেক্ষা অধিক অটল হইয়া রহিলেন। এই শঙ্কা, উদ্বেগ, অগ্নি পরীক্ষা ও কঠোর নির্যাতনের অন্ধকার মাঝে মঙ্গলের বিজলী চমকিতে আরম্ভ করিল।

নবুয়তের ষষ্ঠ বৎসর মুসলমাদের মঙ্গল ও শুভ লক্ষণের তিনটি নক্ষত্র উদিত হইল। প্রথমটি হইল এক নব ইতিহাসের সূচনা- মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম ষড়যন্ত্র করিতে গিয়া মক্কার কাফেরদের জঘন্যরূপে পরাজয় বরণ। ঘটনার বিবরণ এই- মুসলমানগণ পর পর মক্কা ত্যাগ করতঃ আবিসিনিয়ায় যাইতে লাগিলেন, কেহ একা আর কেহ পরিবারবর্গসহ। এইরূপে সর্বমোট ৮৩ জন পুরুষ এবং ১৮ জন মহিলা তথায় পৌছিলেন।

তথাকার শাসনকর্তা ছিলেন অতিশয় ভাল লোক, তাঁহার নাম ছিল 'আসহামা'। তিনি ঈসায়ী বা খৃষ্টান ধর্মের অনুসুরী ছিলেন; কিন্তু তিনি মুলমানদিগকে অতি আদর যত্নের সহিত তথায় বসবাসের সুযোগ প্রদান করিলেন।

মক্কার মোশরেকদের নিকট আবিসিনিয়ায়মুসলমানদের সুখ-শান্তি ও সুযোগ-সুবিধার খবর পৌছিতে লাগিল, ইহাতে তাহারা খুবই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহারা মুসলমানদের তথাকার সুখ-শান্তি নষ্ট করার

চেষ্টা-তদবীরে লাগিয়া গেল। এমনকি, নবুয়তের ষষ্ঠ বৎসরের শেষ দিকে আবিসিনিয়ার বাদশাকে প্রভাবান্বিত করা এবং তথা হইতে প্রবাসী মুসলমানদিগকে বাহির করিয়া দিতে সম্মত করার জন্য তাহারা একটি প্রতিনিধি দল পাঠাইবার ব্যবস্থা করিল। তাহারা আরবের প্রসিদ্ধ কূটনীতিবিদ আম্‌র ইবনুল আছ্‌ * এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবী রবীয়া'কে বহু রকম উপঢৌকন সঙ্গে দিয়া তথায় পাঠাইল। তাহারা দু জনই আবিসিনিয়ায় যাইয়া প্রথমতঃ তথাকার সর্দারগণকে অনেক রকম উপঢৌকন পেশ করিয়া বুঝাইল যে, মক্কার কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক স্বীয় বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করিয়া দেশে অশান্তি-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেছিল। মক্কাবাসীগণ তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিয়াছে; তাহারা তথা হইতে পলায়ন করিয়া আপনাদের দেশে আসিয়া স্থান লইয়াছে। আমরা তাহাদিগকে ধরিয়া দেশে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি। আপনারা এই দেশের সর্দার, আপনারা বাদশাহকে এই ব্যাপারে সম্মত করাইবার জন্য আমাদের সাহায্য করিবেন। বাদশাহ যেন তাহাদিগকে কিছু বলিবার সুযোগ না দিয়া আমাদের হাতে সোপর্দ করেন। কারণ, আমরা তাহাদের সম্পর্কে সব কিছু জানি।

অতপর তাহারা সর্দারগণকে লইয়া বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হইল এবং অনেক কিছু উপঢৌকন পেশ করতঃ মুসলমানদের সম্পর্কে ঐরূপ মন্তব্যই করিল এবং তাহাদিগকে দেশে লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব পেশ করিল। সর্দারগণও বাদশাহকে অনুরোধ করিল যে, তাহাদিগকে ইহাদের হাতে সোপর্দ করিয়া দেওয়া হউক। ইহাতে বাদশাহ রাগান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, তাহারা আমার আশ্রয় লইয়াছে; অতএব আমি তাহাদিগকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিতে পারি না। অবশ্য তাহাদিগকে সম্মুখেই ডাকিয়া আনিতেছি। উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে সকলেরই বক্তব্য শুনা হইবে। যদি তোমাদের বক্তব্য সত্য হয় তবে তাহাদিগকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করা হইবে, নতুবা তাহাদিগকে অধিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবে।

অতপর মুসলমানগণকে ডাকা হইল; তাঁহারা অবিলম্বে কর্তব্য স্থির করার জন্য তাড়াহুড়ার মধ্যে একত্রে সমবেত হইয়া পরামর্শ করিলেন। তাঁহারা জা'ফর (রাঃ)-কে বক্তব্য পেশকারী মনোনীত করিলেন এবং এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আমাদিগকে ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে আমরা ইসলাম ও ঈমানের খাঁটি বক্তব্যই পেশ করিব; নবীজী (সঃ) আমাদিগকে যাহা কিছু শিক্ষা দিয়াছেন সবই প্রকাশ করিয়া দিব, কিছুই গোপন করিব না; তাহাতে আমাদের পরিণাম যাহাই হয় হইবে।

মুসলমান দল বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হইলেন। বাদশাহর দরবারে তাঁহার সকল পারিষদবর্গ তাহাদের ধর্মীয় পুস্তক লইয়া উপস্থিত আছে এবং মক্কা হইতে আগত প্রতিনিধিদ্বয় বাদশাহর দুই দিকে উপবিষ্ট হইয়াছে। তখনকার রীতি ছিল– বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হইয়া প্রথমে সেজদা করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইত। মুসলমান দল বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শুধু সালাম করিলেন, সেজদা মোটেই করিলেন না। উপস্থিত সকলেই আপত্তি জানাইল যে, তোমরা বাদশাহকে সেজদা কেন করিলে না? মুসলমানদের পক্ষে জা'ফর (রাঃ) বলিলেন, আমরা একমাত্র সর্বশক্তিমান সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও সেজদা করি না। তাহারা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি তাঁহার রসূল প্রেরণ করিয়াছেন, সেই রসূল আমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন, আমরা যেন এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহাকেও সেজদা না করি। (যোরকানী, ১–২৮৮)

অতপর স্বয়ং বাদশাহর তরফ হইতে মুসলমানগণকে প্রশ্ন করা হইল যে, তোমরা আমার ধর্মেও নও, বর্তমান যুগের কোন ধর্মেও নও– সর্বধর্ম ত্যাগ করিয়া যে ধর্ম তোমরা লইয়াছ তাহা কি ধর্ম? তদুত্তরে জা'ফর (রাঃ) সুদীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন–

হে বাদশাহ! আমরা অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত বর্বর জাতি ছিলাম, আমরা গর্হিত দেব-দেবীর পূজা করিয়া থাকিতাম। মরা খাইতে এবং ব্যভিচার করিতে দ্বিধাবোধ করিতাম না, আত্মীয়তা ছেদন করিতাম,

* তাঁহারা উভয়ে পরে মক্কা বিজয়ের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পাড়া-প্রতিবেশীর উপর জুলুম-অত্যাচার করিতাম, আমাদের মধ্যে সবল দুর্বলকে গ্রাস করিয়া ফেলিত; আমাদের গোটা জাতির অবস্থাই এইরূপ ছিল। এমতাবস্থায় আমাদের প্রতি আল্লাহর রসূল প্রেরিত হইয়াছেন, যিনি আমাদের মধ্যকারই একজন লোক, আমরা তাঁহার বংশ পরিচয় পূর্ণরূপে অবগত আছি এবং তাঁহার সত্যবাদিতা, আমানতদারী ও পবিত্রতা সম্পর্কেও পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছি। তিনি আমাদিগকে আহ্বান জানাইয়াছেন আমরা যেন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনি, আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া বিশ্বাস করি এবং একমাত্র তাঁহারই উপাসনা–এবাদত করি। আর আমরা এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে পাথর ইত্যাদি দ্বারা তৈয়ারী মূর্তির পূজা করিয়া থাকিতাম আমরা যেন ঐসব ত্যাগ করি। তিনি আমাদিগকে সত্যবাদিতা, আমানতদারী, আত্মীয়তা রক্ষা, প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার এবং হারামকারী ও নরহত্যা হইতে বাঁচিয়া থাকার আদেশ করিয়াছেন। ব্যভিচার, মিথ্যা, এতীমের মাল হরণ এবং কাহারও প্রতি মিথ্যা তোহ্মত লাগাইতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে বিশেষ রূপে আদেশ করিয়াছেন, আমরা যেন আল্লাহর সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক না করি। এতদ্ভিন্ন তিনি আমাদিগকে নামায, যাকাত ও রোযার আদেশ করিয়াছেন। জা'ফর (রাঃ) এইরূপে ইসলামের আহ্কামসমূহে বাদশাহর সম্মুখে ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, আমরা সেই রসূলকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া নিয়াছি। তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং তিনি আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে আমাদের জন্য যে জীবন বিধান আনিয়াছেন, আমরা তাহার অনুসারী হইয়াছি। ফলে আমরা এক আল্লাহর এবাদত করি, আল্লাহর সঙ্গে কোন বক্তকে শরীক বা সাথী সাব্যস্ত করি না। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য যাহা বৈধ করিয়াছেন তাহা বৈধরূপে গ্রহণ করিয়াছি এবং যাহা অবৈধ করিয়াছেন তাহা বর্জন করিয়াছি।

আমাদের উক্ত কার্যধারার উপরই মক্কাবাসীরা আমাদের উপর অমানুষিক জুলুম-অত্যাচার করিয়াছে, ভয়াবহ কষ্ট-যাতনা দিয়াছে এবং আমাদিগকে আমাদের প্রাণপ্রিয় ধর্ম হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, যেন আমরা আল্লাহর এবাদত ছাড়িয়া মূর্তিপূজায় লিপ্ত হই, অবৈধসমূহকে বৈধরূপে গ্রহণ করি। যখন তাহারা জুলুম-অত্যাচার করিয়া আমাদিগকে নিষ্পেষিত করিয়াছে এবং আমাদের ধর্ম পালনে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন আমরা বাধ্য হইয়া দেশ ত্যাগ করিয়াছি। আপনার ন্যায়নিষ্ঠার সুখ্যাতি থাকায় অন্য কোন বাদশাহর প্রতি খেয়াল না করিয়া আপনার রাজ্যে আসিয়াছি; আমরা আপনার আশ্রয়ের আশা করিয়াছিলাম। হে বাদশাহ! আমরা আশা রাখি, আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া কাহারও দ্বারা অত্যাচারিত হইব না।

বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের রসূল আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে যাহা লাভ করিয়াছেন তাহার কোন অংশ কি এখন আপনার স্মরণে আছে?

অতি বিচক্ষণ আল্লাহ ভক্ত ছাহাবী জা'ফর (রাঃ) স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া পবিত্র কোরআনের সূরা মারইয়ামের প্রথম অংশ সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। তাহাতে মনোমুগ্ধকর, সুমধুর ও সুগভীর ভাষায় হযরত ঈসা (আঃ) এবং তাঁহারই একান্ত ঘনিষ্ঠ হযরত ইয়াহ্ইয়ার জন্মবৃত্তান্ত ও মহত্ত্ব বর্ণিত ছিল। হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে সরল সুবোধগম্য যুক্তির মাধ্যমে ইহুদী ও খৃস্টান চরমপন্থীদের বিভিন্ন গর্হিত মতবাদ ও বিশ্বাসের প্রতিবাদ ছিল। উল্লিখিত বিষয়বস্তু এবং ইসলামের উদার সত্যপ্রিয়তা– এইসব এক সঙ্গে সভাস্থলে একটা নূতন ভাবের তরঙ্গ বহাইয়া দিল। ঐ বাদশাহ ঈসায়ী বা খৃস্টান ছিলেন এবং অতিশয় ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন; হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত সত্যের আলো পাইয়া তিনি মুগ্ধ, স্তম্ভিত ও অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এমনকি তিনি আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; তাঁহার অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল।

ঘটনার বর্ণনাকারী শপথ করিয়া বলেন, সমুদয় বৃত্তান্ত ও পবিত্র কোরআন শুনিয়া বাদশাহ কাঁদিতে কাঁদিতে দাড়ি ভিজাইয়া ফেলিলেন এবং উপস্থিত তাঁহার পারিষদবর্গও কাঁদিয়া সম্মুখস্থ পুস্তক ভিজাইয়া ফেলিল। বাদশাহ পবিত্র কোরআন সম্পর্কে মন্তব্য করিলেন, ইহা এবং হযরত ঈসা (আঃ) যেই বাণী নিয়া আসিয়াছিলেন (ইঞ্জীল কিতাব) উভয় এক জ্যোতিঃকেন্দ্র হইতে আবির্ভূত।

বাদশাহ মক্কা হইতে আগত ব্যক্তিদ্বয়কে দরবার হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং পরিষ্কার বলিয়া দিলেন, খোদার কসম! তোমাদের হস্তে এই লোকগণকে কখনও সোপর্দ করিব না এবং তাঁহাদিগকে কোন প্রকার বিব্রতও করা হইবে না, তাঁহারা আমার দেশে শান্তিতে বসবাস করিবেন।

মক্কা হইতে আগত লোকদ্বয় বাদশাহর দরবার হইতে বহিষ্কৃত হইয়াও চেষ্টা পরিত্যাগ করিল না। আমর ইবনুল আ'ছ স্বীয় সঙ্গীকে বলিল, আগামীকল্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন একটি অভিযোগ খাড়া করিব যদ্দারা তাহারা অবশ্যই সুযোগ-সুবিধা হারাইবে। বাদশাহ নাসরানী– তাহাদের আকীদা এই যে, হযরত ঈসা খোদার বেটা। আমি আগামীকল্য বাদশাহকে বলিয়া দিব যে, মুসলমানগণ হযরত ঈসাকে খোদার বান্দা বলিয়া থাকে– খোদার বেটা স্বীকার করে না।

সত্য সত্যই পরদিন তাহারা বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হইল এবং বলিল, হে বাদশাহ! মুসলমানগণ হযরত ঈসা সম্পর্কে সাংঘাতিক কথা বলিয়া থাকে। তাহাদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করুন, তাহারা হযরত ঈসা সম্পর্কে কি বলে?

বাদশাহ মুসলমানগণকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। মুসলমানগণ প্রথমে নিজেরা একত্র হইয়া পরামর্শ করিলেন যে, হযরত ঈসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দেওয়া হইবে। নাসরানী বাদশাহর সম্মুখে এই বিষয়টির আলোচনা মুসলমানদের পক্ষে সর্বাধিক বড় বিপদ ছিল; কিন্তু সকলে এই সিদ্ধান্তই করিল যে, আমাদের পরিণাম যাহাই হউক, আমরা হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে তাহাই বলিব, যাহা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। মুসলমানগণ বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হইলে বাদশাহ তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন, হযরত ঈসা সম্পর্কে আপনারা কি বলিয়া থাকেন? তাঁহার সম্পর্কে আপনাদের মতবাদ কি?

জা'ফর (রাঃ) উত্তর করিলেন, আমরা তাহাই বলি যাহা আমাদের নবী (সঃ) আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। । তিনি আমাদিগকে শিক্ষ দিয়াছেন যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রসূল ছিলেন; তাঁহার আত্মা আল্লাহর বিশেষ আদেশবলে পাক-পবিত্র কুমারী মারইয়ামের গর্ভে পৌঁছিয়াছিল।

এই বক্তব্য শুনিয়া বাদশাহ মাটি হইতে একটি খড় বা কুটা উঠাইয়া তাহার প্রতি ইশারা করতঃ মন্তব্য করিলেন, হযরত ঈসার মর্তবা উক্ত বর্ণনা হইতে এই খড় পরিমাণও অধিক নহে। বাদশাহর এই মন্তব্যে তাঁহার পারিষদবর্গ নাক সিট্‌কাইয়া উঠিল, তাই বাদশাহ ইহাও বলিলেন যে, যদিও তোমরা নাক সিট্‌কাও।

অতপর বাদশাহ মুসলমানগণকে বলিয়া দিলেন, আপনারা আমার দেশে সর্বপ্রকার নিরাপত্তা ভোগ করিবেন এবং তিন বার ইহাও বলিলেন, কেহ আপনাদিগকে মন্দ বলিবে তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আমাকে যদি স্বর্ণের পাহাড়ও দেওয়া হয় তবুও আমি আপনাদের কোন ব্যক্তিকে একটু মাত্র কষ্ট দিব না। বাদশাহ মক্কা হইতে আগত সমুদয় উপঢৌকন ফেরত দেওয়ার নির্দেশও দিলেন। ফলে মক্কা হইতে প্রেরিত লোকদ্বয় ব্যর্থ অপদস্থ হইয়া তথা হইতে বিতাড়িত হইল এবং মুসলমানগণ সুখ-শান্তির সহিত নিরাপদে বসবাস করার অধিক সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। (সীরাতে ইবনে হেশাম– ১)

বাদশাহ আবিসিনিয়াবাসী জনসাধারণ এবং তথাকার পাদ্রীগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আমি বিশ্বাস করি, (মুসলমানগণ যাঁহার কথা বলিতেছেন) তিনি আল্লাহর রসূল এবং তিনি ঐ রসূল যাঁহার সম্পর্কে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ইঞ্জীল কিতাবে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। আমি যদি রাষ্ট্রীয় কার্যে আবদ্ধ না থাকিতাম তবে তাঁহার নিকট অবশ্যই উপস্থিত হইতাম।

এই বাদশাহর অন্তরে তখন হইতে ইসলাম স্থান লাভ করে। অতপর চৌদ্দ বৎসর পর হিজরী সপ্তম সনে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সারা বিশ্বের প্রধান ব্যক্তিদের নিকট যখন ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, তখন সর্বপ্রথম এই বাদশাহর প্রতি বিশেষ দূত ছাহাবী আমর ইবনে

উমাইয়া জামরী (রাঃ) মারফত দুইটি পত্র লিখিয়াছিলেন। একটি ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইয়া, দ্বিতীয়টি ব্যক্তিগত একটি বিষয়ে এবং মক্কা হইতে আবিসিনিয়ায় আগত সকল মুসলমানকে মদীনায় প্রেরণ করার জন্য।

হযরতের লিপি তাঁহার দরবারে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে তিনি লিপির সম্মানার্থ স্বীয় সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন এবং লিপিখানা মাথার উপর বরণ করিয়া লইলেন। আর জা'ফর (রাঃ)-কে ডাকিয়া তাঁহার হস্তে আনুষ্ঠানিকরূপে ইসলাম গ্রহণপূর্বক পূর্ণ শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রকাশ করিয়া হযরতের লিপির উত্তর প্রদান করিলেন এবং দ্বিতীয় পত্রের মর্মানুযায়ী দুইটি বড় বড় সামুদ্রিক নৌকায় তথাকার মক্কাবাসী মুসলমাগণকে মদীনায় পাঠাইয়া দিলেন।

অষ্টম বা নবম হিজরী সনে আবিসিনিয়ায়ই তাঁহার মৃত্যু হয়। (তবাকাতে ইবনে সা'দ ১– ২৫)। মদীনায় থাকিয়া নবী (সঃ) ওহী মারফত তাঁহার মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়া মদীনার ছাহাবীগণসহ তাঁহার গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করেন * এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ সৌভাগ্যসূচক মন্তব্য করেন যাহা হাদীছে আছে–

১৬৭৯। হাদীছ ঃ عن جابر رضى الله تعالى عنه قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ مَاتَ النَّجَاشِيْ مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقُوْمُوْا عَلٰى اَخِيْكُمْ اَصْحَمَةَ۔

অর্থ ঃ জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যেদিন নাজাশী– আবিসিনিয়ার বাদশাহর মৃত্যু হইল, ঐদিনই হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিলেন, অদ্য একজন নেককার লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তোমরা সকলে চল, তোমাদেরই ভ্রাতা (আবিসিনিয়ার বাদশাহ) আস্‌হামার জানাযার নামায আদায় কর।

(রসূলের মুখে "নেককার" আখ্যা কতই না সৌভাগ্যজনক।)

১৬৮০। হাদীছ ঃ عن جابر رضى الله تعالى عنه اَنَّ نَبِيَّ اللّٰه صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى عَلَى النَّجَاشِيْ فَصَفَفْنَا وَرَائَهٗ فَكُنْتُ فِى الصَّفِّ الثَّانِيْ اَوِ الثَّالِثِ۔

অর্থ ঃ জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (মদীনায় থাকিয়া) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আবিসিনিয়ার বাদশাহর জন্য জানাযার নামায পড়িয়াছেন। আমাদিগকে নিয়মিতভাবে তাঁহার পিছনে সারিবদ্ধরূপে দাঁড় করাইলেন; আমি দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারিতে উপস্থিত ছিলাম।

১৬৮১। হাদীছ ঃ عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعٰى لَهُمُ النَّجَاشِيْ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ ۔ صَفَّ بِهِمْ فِى الْمُصَلّٰى فَصَلّٰى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا ۔

---

* সম্রাট আস্‌হামা শাহে আবিসিনিয়া, যিনি মুসলমানগণকে তাঁহার দেশে আশ্রয় দিয়াছিলেন, সপ্তম হিজরী সনে তাঁহারই নিকট হযরতের লিপি প্রেরিত হইয়াছিল এবং তিনি পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য রাষ্ট্রীয় কার্যে আবদ্ধতার দরুন তিনি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অবশেষে অষ্টম হিজরীতে বা নবম হিজরীর প্রারম্ভে আবিসিনিয়ায় তাঁহার মৃত্যু হইলে পর মদীনায় থাকিয়া হযরত নবী (সঃ) তাঁহার জানাযার নামায আদায় করিয়াছিলেন।

তাঁহার পর আবিসিনিয়ায় সিংহাসনের অধিকারী যে ব্যক্তি হইয়াছিলেন হযরত নবী (সঃ) তাঁহার নিকট নবম হিজরী সনে লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম এবং ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায় নাই, বরং অনেকে তাহাকে কাফের বলিয়াছেন।

মুসলিম শরীফের এক হাদীছে এই দ্বিতীয় বাদশাহ এবং তাহার প্রতি লিপি যাহা নবম হিজরীতে লেখা হইয়াছিল তাহারই উল্লেখ রহিয়াছে। (ফাতহুল বারী ৮–১০৫)

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যেদিন আবিসিনিয়ার বাদশাহর মৃত্যু হইল ঐদিনই হযরত রসূলুল্লা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (মদীনায়) ছাহাবীগণকে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ জানাইলেন এবং সকলকে বলিলেন, তোমরা তোমাদের ভ্রাতার জন্য মাগফেরাতের দোয়া কর এবং জানাযার নামায পড়ার নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া সকলকে সারিবদ্ধরূপে দাঁড় করাইলেন। অতপর তাঁহার প্রতি জানাযার নামায পড়িলেন এবং চারি তকবীরে নামায আদায় করিলেন।

আবু বকরের আবিসিনিয়ায় হিজরতের প্রস্তুতি

দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন ছাহাবী পর পর হাব্‌শা বা আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া যাইতেছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও নিজ গোষ্ঠী-জ্ঞাতি মোশরেকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। মন ভরিয়া নামায পড়ার, প্রাণ খুলিয়া পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করার অভাব ও বাধা তাঁহাকে এতই ব্যথিত করিল যে, এই ব্যথা-বেদনা তিনি কোন মতেই সহ্য করিয়া উঠিতে পারিলেন না। নিরুপায় হইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট তিনিও আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি চাহিলেন। হযরত (সঃ) তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। আবু বকর (রাঃ) মক্কা হইতে যাত্রা করিলেন; দুই দিনের পথ অতিক্রমের পর মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রসিদ্ধ "কারাহ্" গোত্রের সর্দার ইবনে দাগেনার সহিত সাক্ষাত হইলে তিনি তাঁহাকে মক্কা ত্যাগে বাধা দিলেন এবং যাত্রা ভঙ্গ করিয়া মক্কায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য করিলেন। (বেদায়া ৩-৯৩)। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নের হাদীছে রহিয়াছে।

১৬৮২। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা- ৫৫১) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মাতা-পিতাকে চিনিবার বয়স হইতেই আমি তাঁহাদের উভয়কে দ্বীন ইসলামের উপর দেখিতে পাইয়াছি এবং আমাদের সঙ্গে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এত অধিক ঘনিষ্ঠতা ছিল যে, একটি দিনও ফাঁক যাইত না যে দিন হযরত (সঃ) সকালে বা বিকালে আমাদের বাড়ীতে তশরীফ না আনিতেন।

সেই সময় মক্কার কাফেরদের তরফ হইতে মুসলমানদের উপর ভয়াবহ অত্যাচার-নির্যাতন চলিতেছিল (মুসলমানগণ মক্কা ত্যাগ করত আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া যাইতেছিলেন)। তখন (আমার পিতা) আবু বকর (রাঃ) আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করতঃ মক্কা ত্যাগ করিলেন। (মক্কা হইতে দুই দিনের পথে) 'বরকুল গেমাদ' নামক স্থানে পৌঁছার পর তাঁহার সঙ্গে আরবের প্রসিদ্ধ 'কারাহ্' গোত্রের সর্দার ইবনে দাগেনার সাক্ষাত হইল। তিনি আবু বকর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় যাইতেছেন? আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমার বংশীয়গণ আমাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করিয়াছে, সুতরাং স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারের গোলামী বন্দেগী যাহাতে সুষ্ঠুরূপে করিয়া যাইতে পারি এই উদ্দেশে দেশ ভ্রমণ করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি (আবিসিনিয়ায় যাওয়ার উদ্দেশ্য গোপন রাখিলেন)।

ইবনে দাগেনা বলিলেন, হে আবু বকর! আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তি দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইতে পারে না এবং আপনার ন্যায় ব্যক্তিকে দেশত্যাগ করিতেও দেওয়া যায় না। (আপনি হইলেন মহৎ গুণাবলীর আকর, যথা-) বেকার রোজগারহীনের রুজির ব্যবস্থাকারী, আত্মীয়তার পূর্ণ হক্ আদায়কারী, নিরুপায়ের উপায়, অতিথি সেবায় আত্মনিয়োগকারী এবং সত্যের জন্য আগত আপদ-বিপদে সাহায্য দানকারী। আমি আপনার নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের ভার গ্রহণ করিলাম, আপনি নিজ দেশে থাকিয়াই আপনার প্রভু-পরওয়ারদেগারের এবাদত-বন্দেগী করিতে থাকুন।

সেমতে আবু বকর (রাঃ) মক্কার দিকে ফিরিয়া আসিলেন এবং ইবনে দাগেনাও তাঁহার সঙ্গে মক্কায় আসিলেন। ইবনে দাগেনা কোরায়শ প্রধানদের সকলের নিকট ঐ দাবীই জানাইলেন যে, আবু বকরের ন্যায় মহান ব্যক্তিকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করা যায় না এবং তাঁহাকে দেশ ত্যাগ করিতেও দেওয়া যায় না। সঙ্গে

সঙ্গে তাঁহার মহৎ গুণাবলীর উল্লেখ করিলেন। কোরায়শ প্রধানগণ আবু বকরের জন্য ইবনে দাগেনার নিরাপত্তাদান সমর্থন করিল, বিরোধিতা করিল না। অবশ্য তাহারা ইবনে দাগেনাক বলিল, আপনি আবু বকরকে বলিয়া দিন, তিনি যেন স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারের এবাদত-বন্দেগী নিজের ঘরের ভিতরে থাকিয়াই করেন। ঘরের ভিতরে থাকিয়াই যেন নামায আদায় করেন এবং তথায় যত ইচ্ছা কোরআন পাঠ করেন। তিনি যেন খোলাখুলি প্রকাশ্যে কোরআন পাঠ করিয়া আমাদের উৎকণ্ঠা সৃষ্টি না করেন; তাঁহার কোরআন পাঠ শ্রবণে আমাদের স্ত্রী-পুত্রগণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িবে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হয়।

ইবনে দাগেনা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট তাহাদের এই কথাগুলি পেশ করিলেন, সেমতে আবু বকর (রাঃ) কিছু দিন ঐভাবেই এবাদত-বন্দেগী করিয়া যাইতে লাগিলেন– প্রকাশ্যে নামাযও পড়িতেন না এবং ঘরের ভিতর ছাড়া কোরআন পাঠও করিতেন না। কিন্তু তিনি বেশী দিন এই বাধ্য-বাধ্যকতার মধ্যে থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্বীয় বাড়ীর বহির্ভাগে একখানা মসজিদ তৈয়ার করিলেন এবং তথায় নামায আদায় ও কোরআন পাঠ আরম্ভ করিলেন। আবু বকর (রাঃ) অতিশয় কান্নাকাটির সহিত কোরআন পাঠ করিয়া থাকিতেন, কোরআন পাঠকালে তিনি নয়নযুগলের অশ্রুধারা সামলাইয়া রাখিতে পারিতেন না। কাফেরদের স্ত্রী-পুত্রগণ তাঁহার কোরআন পাঠের দৃশ্য দেখিবার জন্য ভিড় জমাইয়া বসিত এবং তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিত, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইত।

কোরায়শ প্রধানগণ এই অবস্থাদৃষ্টে ভীত হইয়া পড়িল; তাহারা ইবনে দাগেনাকে সংবাদ দিল। ইবনে দাগেনা আসিলে পর তাহারা বলিল, আমরা আবু বকরের জন্য আপনার নিরাপত্তা দান এই শর্তে গ্রহণ করিয়াছিলাম যে, তিনি প্রকাশ্যে নামায আদায় এবং কোরআন পাঠ হইতে বিরত থাকিবেন। এখন তিনি প্রকাশ্যেই নামায পড়েন এবং কোরআন পাঠ করিয়া থাকেন, যাহাতে আমাদের স্ত্রী-পুত্রগণের ব্যাপারে আমাদের আশঙ্কা হইতেছে। আবু বকরকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিয়া দিন। তিনি যদি ঘরের ভিতরে থাকিয়া এবাদত-বন্দেগী করিতে রাজি হন তবে ভাল, অন্যথায় তাঁহাকে বলুন– তিনি যেন আপনার নিরাপত্তা দান ফেরত দিয়া দেন; আমরা আপনার নিরাপত্তাদান ভঙ্গ করা ভাল মনে করি না। অপর দিকে আবু বকর তাঁহার কার্যকলাপ প্রকাশ্যেই করিয়া যাইবেন, আমরা কিছুতেই বরদাশত করিতে পারিব না ।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, তাহাদের কথা মতে ইবনে দাগেনা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট আসিলেন এবং কোরায়শ প্রধানদের অভিপ্রায় তাঁহাকে জ্ঞাত করিয়া বলিলেন, আপনি জানেন আমি আপনাকে কি বলিয়াছিলাম। এখন আপনি হয়ত তাহাদের কথা রক্ষা করিয়া চলুন, না হয় আমার প্রদত্ত নিরাপত্তা ফিরাইয়া দিন। আমি ইহাতে বড়ই মর্মাহত হইব যে, আরবের লোকগণ শুনিতে পাইবে একটি লোকের পক্ষে আমার প্রদত্ত নিরাপত্তা ভঙ্গ করা হইয়াছে।

এতশ্রবণে আবু বকর (রাঃ) স্পষ্ট ভাষায় ইবনে দাগেনাকে বলিয়া দিলেন, আপনার প্রদত্ত নিরাপত্তা আপনাকে ফেরত দিয়া দিলাম। আমি একমাত্র আল্লাহ তাআলার আশ্রয়ের উপর সন্তুষ্ট রহিলাম। এই সময় হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন (আবু বকর (রাঃ) ঐ অবস্থায় মক্কায় থাকিয়া গেলেন, পরে মদীনায় হিজরত করিলেন)।

আবিসিনিয়ায় প্রবাসী মুসলমানদের দ্বারা ইসলামের প্রভাব

মৌখিক তবলীগ অপেক্ষা আদর্শ ও চরিত্রের তবলীগ অধিক শক্তিশালী ও ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। আবিসিনিয়ায় প্রবাসী মুসলিম নর-নারীগণ তথায় নিয়মিত ধর্ম প্রচারের তেমন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চয় পান নাই। বাদশাহর উদারতায় তাঁহারা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও শান্তির সুবিধা পাইয়া থাকিলেও পরদেশ, চতুর্দিক হইতে শত্রুতার পরিবেশ, যেখানে প্রাণ বাঁচানোই দুষ্কর হইয়া পড়িতেছিল, সেক্ষেত্রে আবার ধর্ম প্রচারের

অবকাশ কোথায়? কিন্তু তাঁহাদের জীবন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আদর্শে এমনভাবে গঠিত হইয়াছিল যে, তাঁহাদিগকে দেখিলেই লোকের মনে তাঁহাদের ধর্ম ও আদর্শের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিত; প্রকৃত মুসলমানের লক্ষণই ইহা। সেমতে প্রবাসী মুসলমানদের দ্বারা আবিসিনিয়ায় মৌখিক ইসলাম প্রচার না চলিলেও আদর্শ ও চরিত্রে নির্বাক প্রচার অবশ্যই চলিত। এমনকি তথাকার খৃস্টানদের অনেকের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি হইল– ইহারা যেই নবীর উম্মত সেই নবীকে দেখা দরকার। এই আকর্ষণের ফলে আবিসিনিয়ার কুড়ি জন খৃস্টান মক্কায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নবীজী (সঃ) একা একা হরম শরীফের মসজিদে বসিয়া ছিলেন। আর নিকটেই দারে-নোদওয়া তথা মক্কার বিশেষ মিলনায়তনে আবু জাহল গোষ্ঠী বসিয়াছিল।

ঐ খৃস্টানগণ নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাক্ষাতে আসিয়া কতিপয় তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। নবীজী (সঃ) উত্তর দিলেন এবং তাঁহাদিগকে পাক কালাম কোরআন তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। তাহাতে তাঁহারা এতই অভিভূত হইলেন যে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া ফেলিলেন এবং তৎক্ষণাত ইসলাম গ্রহণে ধন্য হইলেন। তাঁহাদের কাঁদা ও অশ্রু বর্ষণের দৃশ্য এবং তাঁহাদের হৃদয়পটে পবিত্র কোরআনের সুগভীর রেখাপাত এতই আকর্ষণীয় ছিল যে, সেই দৃশ্য উল্লেখপূর্বক তাঁহাদের এবং তাঁহাদের শ্রেণীর ঈসায়ী সম্প্রদায়ের প্রশংসা করিয়া পবিত্র কোরআনে সুদীর্ঘ বর্ণনা অবতীর্ণ হইল। সেই বর্ণনায় তাঁহাদের অশ্রুপাত এবং পবিত্র কোরআন দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ের ভাবাবিষ্টতা হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে–

وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۔ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ۔ فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۔ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ۔

অর্থ ঃ "তাঁহারা যখন শুনিলেন ঐ মহাবাণী যাহা রসূলের প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তখন তুমি দেখিতেছ, তাঁহাদের নয়নযুগলে অশ্রু প্রবাহমান; সত্য অনুধাবন করার দরুন তাঁহারা বলিতেছিলেন, হে প্রভু! আমরা ঈমান গ্রহণ করিয়াছি। অতএব ঈমান ঘোষণাকারীদের দলে আমাদের নাম লিখিয়া নিন। আল্লাহর প্রতি এবং তাঁহার তরফ হইতে যে সত্য আমাদের নিকট আসিয়া গিয়াছে তাহার প্রতি ঈমান স্থাপন না করিয়া আমরা আশা রাখিব, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সৎ লোকদের দলভুক্ত করিয়া দিবেন– এইরূপ আশা রাখা আমাদের জন্য কি ফলদায়ক ও সঙ্গত হইবে? এই হৃদ্যতাপূর্ণ উক্তির ফলে আল্লাহ তাঁহাদের মহাপ্রতিদান বেহেশত দিবেন, যাহার বাগ-বাগিচায় প্রবাহমান রহিয়াছে নদী-নালা। তাঁহারা তথায় চিরস্থায়ীরূপে থাকিবেন। সৎ-সুধীগণের প্রতিদান ইহাই।" (পারা–৭ আরম্ভ)

ঐ আগন্তুকগণ ইসলাম বরণ করিয়া নবীজী (সঃ) হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক নিজ দেশে যাত্রা করিলেন। সেই মুহূর্তেই আবু জাহল এবং তাহার দলীয় কতিপয় দুষ্কৃতকারী আসিয়া তাঁহাদেরকে ভর্ৎসনাপূর্বক বলিল, তোমাদের ন্যায় বেকুফের দল আর দেখি নাই! তোমরা এইরূপ হঠাৎ নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করিয়া ফেলিলে? তাঁহারা বলিলেন, তোমাদের সঙ্গে কথা বলা হইতে সালাম– তোমাদের সঙ্গে কোন কিছু বলিতে চাই না, তোমাদের মতে তোমরা থাক; আমাদেরকে আমাদের মতে থাকিতে দাও। (আসাহহুস সিয়ার– ৯৮)

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীগণের ফযীলত

১৬৮৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬০৭) আবু মূসা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মদীনায় হিজরতের সংবাদ আমরা অবগত হইলাম– তখন আমরা (আমাদের দেশ) ইয়ামানেই (মুসলমান

হইয়া) অবস্থান করিতেছিলাম। নবীজীর হিজরত সংবাদে আমি এবং আমার বড় দুই সহোদরসহ তিপ্পান্ন জন জ্ঞাতি-গাষ্ঠী লোকের সহিত মদীনায় হিজরত উদ্দেশে আমরা ইয়ামান হইতে যাত্রা করিলাম। আমরা একটি সমুদ্রযানে আরোহণ করিলাম; প্রতিকূল ঝড়ো বাতাস আমাদের যানটি নাজাশী বাদশাহর দেশ হাবশা তথা আবিসিনিয়ায় পৌঁছাইয়া দিল।

তথায় জাফর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সহিত আমাদের সাক্ষাত হইল। আমরা কিছুকাল তথায় অবস্থান করিলাম। (৭ম হিজরী সনে) যখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম খায়বর দেশ জয় করিয়াছেন তখন আমরা আবিসিনিয়া হইতে সকল প্রবাসী মুসলমান একটি সামুদ্রিক নৌকায় চড়িয়া মদীনায় পৌঁছিলাম। যাঁহারা আমাদের পূর্বে মদীনায় পৌঁছিয়াছিলেন তাঁহারা আমাদিগকে (কৌতুক করিয়া) বলিতেন, আমরা আপনাদের অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যশালী। কারণ, আমরা আপনাদের পূর্বে হিজরত করিয়া নবীজীর নিকটে পৌঁছিয়াছি।

আমাদের নৌকায় আগতদের মধ্যে "আসমা" নাম্নী এক মহিলা ছিলেন। তিনি নবী গৃহিণী হাফসা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সহিত সাক্ষাতের জন্য তাঁহার গৃহে আসিলেন। তিনি পূর্বে হাবশায় হিজরত করিয়াছিলেন, তথায় তাঁহাদের উভয়ের পরিচয় ছিল। আসমা (রাঃ) ঐ গৃহে উপস্থিত। এমন সময় (হাফসার পিতা) ওমর (রাঃ) তথায় আসিলেন এবং আসমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হাফসা (রাঃ) বলিলেন, তিনি ওমায়স তনয়া আসমা। ওমর (রাঃ) বলিলেন, আবিসিনিয়া হইতে সমুদ্রযানে আগত? আসমা বলিলেন, হাঁ। তখন ওমর (রাঃ) সেই কথাটিই বলিলেন— আমরা মদীনায় তোমাদের পূর্বে হিজরত করিয়া আসিয়াছি; আমরা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অধিক নৈকট্যলাভকারী। এতদশ্রবণে আসমা ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, (আমাদের অপেক্ষা আপনারা অধিক নৈকট্যের অধিকারী) ইহা কখনও নহে; কসম খোদার! আপনারা (আরামে) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন; তিনি আপনাদের অনাহারীর আহার যোগাইয়াছেন, অশিক্ষিতকে শিক্ষা ও উপদেশ দান করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ) হইতে দূরে, শত্রুর দেশে ছিলাম, (আমরা কত কষ্ট করিয়াছি! এবং আমাদের এইসব কষ্ট ভোগ একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের সন্তুষ্টি লাভ উদ্দেশে ছিল)।

আমি শপথ করিলাম— আপনার এই কথার অভিযোগ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট পেশ না করিয়া পানাহার করিব না। আমরা কত প্রকারে উৎপীড়িত হইয়াছি! কত রকম ভয়-ভীতির মধ্যে কালাতিপাত করিয়াছি; সব কিছু আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সমীপে ব্যক্ত করিব এবং (প্রতিফল সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করিব। খোদার কসম! আমি একটুও মিথ্যা বা গর্হিত অতিরঞ্জিত কথা বলিব না।

ইতিমধ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম গৃহে আসিলেন। তখন আসমা (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! ওমর এইরূপ বলিয়াছেন। নবী (সঃ) আসমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তাহাকে কি উত্তর দিয়াছ? আসমা বলিলেন, উত্তরে আমি এই এই বলিয়াছি। নবী (সঃ) বলিলেন, ওমর শ্রেণীর লোকেরা তোমাদের অপেক্ষা অধিক নৈকট্যের অধিকারী কখনও নহে। ওমর ও তাহার শ্রেণীর লোকদের একটি মাত্র হিজরত হইয়াছে (মক্কা হইতে মদীনায়)। আর নৌকাযোগে আগত তোমাদের দুইটি হিজরত হইয়াছে (একটি নিজ দেশ হইতে আবিসিনিয়ায় এবং অপরটি আবিসিনিয়া হইতে মদীনায়)।

আসমা (রাঃ) বলিলেন, আবু মূসা (রাঃ) এবং নৌকায় আগত ছাহাবীগণ দলে দলে আমার নিকট আসিতেন এবং এই হাদীছ শুনিয়া যাইতেন। দুনিয়ার কোন বস্তু তাঁহাদের নিকট অধিক আনন্দদায়ক ও অধিক বড় ছিল না তাহা অপেক্ষা, যাহা নবী ছাল্লাল্লাহু আল্লাইহি অসাল্লাম তাঁহাদের সম্পর্কে বলিয়াছিলেন। ছাহাবী আবু মূসা (রাঃ) ত এই হাদীছখানা পুনঃ পুনঃ আমার নিকট খোঁজ করিয়া শুনিয়া থাকিতেন।

নবুয়তের ষষ্ঠ বৎসর মুসলমানদের পক্ষে শুভ লক্ষণের উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় ঘটনা হইল শেরে খোদা

হাম্‌যা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণ।*

মুসলমানদের বিরুদ্ধে মোশরেকগণ কর্তৃক আবিসিনিয়ায় প্রতিনিধি প্রেরিত হওয়ার সময়ই হামযা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন।

হামযা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

একদা নবী (সঃ) সাফা পর্বতের নিবটবর্তী পথে যাইতেছিলেন; ঐ সময় আবু জাহলের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাত হইল। দুরাচার আবু জাহল নবীজী (সঃ)-কে পথে পাইয়া অশ্লীল অশোভনীয় কথাবার্তা ও গালিগালাজ শুনাইল। সে দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধেও জঘন্য কথা বলিল। নবীজী (সঃ) তাহার কথার কোন প্রতিউত্তর করিলেন না; অসভ্যের কথার উত্তরই চুপ থাকা– নবীজী (সঃ) তাহাই করিলেন। মক্কারই এক ব্যক্তির দাসী ঘটনা দেখিয়াছিল; ইতিমধ্যেই বীরবর হামযা শিকার করিয়া তীর-ধনুকসহ বাড়ী যাইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ঐ দাসীর সাক্ষাত হইল; সে তাঁহাকে বলিল, আপনি যদি দেখিতেন! কিভাবে আবু জাহল আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে গালিগালাজ করিয়াছে! ইহা শুনামাত্র বীর হামযা অগ্নিমূর্তি হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাত আবু জহলের তালাশে ছুটিলেন। হরম শরীফে যাইয়া তাহাকে লোকদের সহিত বসা পাইলেন; ঐ অবস্থায় বীর হামযা স্বীয় ধনুক দ্বারা আবু জাহলের মাথায় আঘাত করিলেন; তাহার মাথা ফাটিয়া গেল। হামযা (রাঃ) উত্তেজিতভাবে তাহাকে বলিলেন, তুমি না-কি মুহাম্মদ (সঃ)-কে গালাগালি করিয়াছ? শুনিয়া রাখ! আমি তাঁহার ধর্মে রহিয়াছি। উপস্থিত কেহ কেহ আবু জাহলের পক্ষে উত্তেজিত হইতেছিল; কিন্তু আবু জাহল তাহাদের বারণ করিয়া বলিল, হামযাকে কিছু বলিও না; সত্যই আমি আজ তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে শক্ত কথা বলিয়াছি। আমি অন্যায়ভাবে তাহাকে জলুম করিয়াছি। পাষণ্ড আবু জাহল সাংঘাতিকরূপে অপমানিত হইয়াও সাধু সাজিল! কারণটা সহজেই অনুমেয়, বীর হামযার অবস্থা সে বুঝিতে পারিয়াছিল, সর্বনাশ উপিস্থিত। এখন সদ্ব্যবহার ও সাধুতার দ্বারা হামযাকে শান্ত না করিলে আরবের একজন প্রধানতম বীর তাহাদের দল ছাড়া হইয়া যাইবে এবং কোরায়শরা এই সর্বনাশের জন্য তাহাকে দায়ী করিবে। আবু জাহল কূটবুদ্ধি খাটাইল, কিন্তু বীর হামযাকে স্বর্গীয় মঙ্গলের আলিঙ্গন হইতে বারণ করিতে পারিল না।

উপস্থিত এক ব্যক্তি চমকিত হইয়া বীরবর হামযাকে জিজ্ঞাসা করিল, সত্যই কি আপনি ধর্মমত পরিবর্তন করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যে সত্য তাহা আমার হৃদয়পটে বিদ্ধ হইয়া গিয়াছে; আমি ঘোষণা দিতেছি, তিনি আল্লাহর রসূল; তাঁহার সব কথা সত্য। তথা হইতে বাড়ী আসিলে পর শয়তান তাঁহার পিছনে লাগিল, কুমন্ত্রণা দিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, এমনকি রাত্রেও তাঁহার নিদ্রা আসিল না। তিনি এই বলিয়া আল্লাহ তাআলার দরবারে আরাধনা করিলেন, আয় আল্লাহ! যদি ইহা (ইসলাম) সত্য হইয়া তাঁকে তবে আমার অন্তরকে তৎপ্রতি স্থির করিয়া দাও; আর যদি অসত্য হয় তবে ইহা হইতে বাহির হওয়ার ব্যবস্থা আমার জন্য করিয়া দাও। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, এই আরধনা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরের সকল দ্বিধা দূর হইয়া ইসলামের বিশ্বাসে অন্তর ভরিয়া গেল। ভোরবেলা নবীজী (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হইলাম এবং সব ঘটনা ব্যক্ত করিলাম; তিনি আমার দ্বীন-ইসলামের মজবুতীর জন্য দোয়া করিলেন। আমি আনুষ্ঠানিকরূপে ঘোষণা দিলাম, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি সত্য,আপনার সব কিছু সত্য এবং আপনি সত্যের দিশারী।

ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

হামযা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণের তিন দিন পরেই তদপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা– ইসলামের ষষ্ঠ বৎসরের তৃতীয় শুভ লক্ষণ ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণ।

* কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে হামযা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণ নবুয়তের দ্বিতীয় বৎসর ছিল।

ধীরে ধীরে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এমনকি বহু সংখ্যক মুসলমান আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া যাওয়ার পরও মক্কায় অবস্থানকারী মুসলমানদের সংখ্যা চল্লিশে পৌঁছিল এবং বীরবর হামযা (রাঃ) ইসলামের দলে আসিলেন। কোরায়শরা নিজেদের প্রমাদ গনিতে লাগিল। তাহারা পরামর্শে বসিল এবং নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে প্রাণে বধ করা সাব্যস্ত করিল। অতপর তাহারা ব্যতিব্যস্ত হইল হত্যাকারী সাহসী বীর পুরুষের তালাশে। ওমর তাহার জন্য প্রস্তুত হইল এবং তরবারি লইয়া নবীজীর খোঁজে বাহির হইল। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাঁহার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া বলিল, প্রথমে নিজের ঘর সামলাও; তোমার ভগ্নী ফাতেমা এবং ভগ্নীপতি সায়ীদ মুসলমান হইয়া গিয়াছেন। এই সংবাদে ওমর অগ্নিমূর্তি ধারণ করিল এবং সোজা ভগ্নীর বাড়ী রওয়ানা হইল। ঐ সময় ভগ্নী ও ভগ্নীপতি উভয়ই তাঁহাদের গৃহে ছিলেন। (পূর্বালোচিত) খাব্বাব (রাঃ) তাঁহাদিগকে পত্রে লিখিত পবিত্র কোরআন শরীফ শিক্ষা দিতেছিলেন; গৃহদ্বার বন্ধ ছিল।

ওমর আসিয়া গৃহদ্বারে করাঘাত করিলে খাব্বাব (রাঃ) লুকাইয়া গেলেন; ভগ্নি আসিয়া দরজা খুলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ওমর তাঁহার শিরে আঘাত করিয়া রক্তস্রোত বহাইয়া দিলেন এবং শাসাইয়া বলিলেন, তুই ধর্মত্যাগী হইয়া গিয়াছিস্? ঘরে আসিয়া ভগ্নীপতিকেও ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, নিজ ধর্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছ? তিনি বলিলেন, যদি অন্য ধর্মটি সত্য হয়? এই উত্তর শুনার সঙ্গে সঙ্গে ওমর তাঁহার উপরও ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং মাটিতে ফেলিয়া বেদম প্রহার করিলেন। ভগ্নী তাঁহাকে ছাড়াইতে আসিলে পুনরায় ভগ্নীকেও প্রহারে রক্তাক্ত করিয়া ফেলিলেন। এইবার ভগী ক্রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, মুসলমান হওয়ার করাণে আমাদের মারা হইতেছে! নিশ্চয় আমরা মুসলমান হইয়াছি; যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।

মারপিট করিয়া ওমর ক্ষান্ত হইয়াছেন। এখন তাঁহার দৃষ্টি পড়িল ঐ পত্রের প্রতি, যে পত্রে কোরআন শরীফের আয়াত লিখা ছিল। তিনি বলিলেন, তাহা কি? আমার হাতে দাও ত! ভগ্নী বলিলেন, আপনি অপবিত্র; অপবিত্র হাতে তাহা স্পর্শ করিতে পারেন না! ওমর বিনাবাক্য ব্যয়ে অযূগোসল করিয়া আসিলেন এবং ঐ পত্র পাঠ করিলেন; তাহাতে সূরা ত্বা-হার এই আয়াত লিখা ছিল–

اِنَّنِىْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى ـ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ فَتَرْدٰى ـ

অর্থ ঃ "একমাত্র আমিই আল্লাহ– মাবুদ, আমি ভিন্ন আর কোন মাবুদ বা উপাস্য নাই, অতএব আমারই বন্দেগী কর এবং আমাকে স্মরণ করিতে নামায আদায় কর। নিশ্চয় কেয়ামত আসিবে; যেন প্রতিটি মানুষ কৃত কর্মের ফল পায়– অবশ্য তাহার তারিখ আমি গোপন রাখিয়াছি। যাহারা সেই কেয়ামতে বিশ্বাস করে না এবং প্রবৃত্তির দাস হইয়া চলে তাহারা যেন তাহার প্রতি আস্থা স্থাপনে তোমাকে বিরত রাখিতে না পারে; অন্যথায় তুমি ধ্বংস হইয়া যাইবে।" এই আয়াত কয়টির বিষয়বস্তু ওমরের অন্তরকে কাঁপাইয়া তুলিল।

ইতিপূর্বে আরও একবার পবিত্র কোরআন লৌহমানব ওমরকে সত্যের প্রতি ধাক্কা দিয়াছিল। ঘটনা এই– একদা গভীর রাত্রে ওমর কা'বা ঘরের নিকট গেলেন; তখন নবীজী (সঃ) তথায় নামায পড়িতেছিলেন। ওমর বলেন, আমি লুকাইয়া তাঁহার পড়া শুনিবার ইচ্ছা করিলাম। সেমতে আমি কা'বার গেলাফের ভিতরে আত্মগোপন করিয়া তাঁহার সম্মুখ বরাবর দাঁড়াইলাম। নবীজী (সঃ) সূরা "আল্-হাক্কাহ্ (পারা–২৯) পাঠ করিতেছিলেন। আমি তাহা শুনিতেছিলাম; আমার মনে তখন নূতন নূতন ভাবের উদয় হইতে লাগিল। এই সময় আমার মনে হইতেছিল, কোরায়েশগণ যাহা বলিয়া থাকে তাহাই ঠিক– ইনি একজন বিশিষ্ট কবি। সেই মুহূর্তে নবীজী (সঃ) উক্ত সূরার এই আয়াত পাঠ করিতেছিলেন–

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ـ وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ـ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ـ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ

قَلِيْلاً مَّا تُؤْمِنُوْنَ ـ

অর্থ ঃ "তোমাদের দৃশ্য-অদৃশ্য সমুদয় বস্তুর শপথ– এই কোরআন আল্লাহর কালাম, আল্লাহর (অদৃশ্য) বিশিষ্ট দূতের মারফত তাঁহার (দৃশ্য) রসূলের নিকট প্রেরিত। ইহা কোন কবির রচনা নহে। পরিতাপের বিষয় তোমরা তাহার প্রতি কমই বিশ্বাস স্থাপন কর।"

ওমর (রাঃ) বলেন– ইহা শ্রবণে আমি ভাবিলাম, এ ত আমারই মনের কথার উত্তর। অতএব নিশ্চয় মুহাম্মদ (সঃ) বড় গণৎকার। আমার মনে এই ভাবের উদয় হইতেছিল আর নবী (সঃ) উক্ত সূরার এই আয়াত পাঠ করিতেছিলেন–

وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ ـ

অর্থ ঃ "এবং তাহা কোন গণৎকারের উক্তিও নহে; তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণমূলক তাহা গভীর চিন্তার সহিত শুনিয়া থাক।"

ওমর বলেন, এই আয়াতসমূহ আমার অন্তরে যথেষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিল।

এই আয়াতগুলি ওমরের অন্তরকে ধাক্কা দিল বটে, কিন্তু তাঁহাকে দীর্ঘ দিনের বদ্ধমূল কুফর ও শেরেক ত্যাগে নত করিতে পারিল না। অতপর পুনরায় উপরোল্লিখিত ঘটনায় সূরা ত্বা-হার আয়াতসমূহ দ্বারা যে ধাক্কা ওমরের অন্তরে লাগিল তাহা তিনি সামলাইয়া উঠিতে পারিলেন না। এইবার তিনি সম্পূর্ণরূপে সত্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন।

সূরা ত্বা-হার আয়াতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করা মাত্র ওমরের অন্তরে পরিবর্তন আসিয়া গেল। উপস্থিত খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট জানিতে পারিলেন, নবীজী (সঃ) আরকাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহে আছেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চরণে নিজকে উৎসর্গ করিয়া ইসলাম গ্রহণ উদ্দেশে সেই দিকে ছুটিলেন। এই বিরাট পরিবর্তনের সংবাদ কাহারও গোচরে আসে নাই, ধারণায়ও আসিতে পারে না।

আরকামের গৃহদ্বারে পৌঁছিয়া ওমর দরজায় করাঘাত করিলেন; তাঁহার হস্তে তরবারি ছিল। ভিতরে অবস্থিত ছাহাবীগণ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন; হামযা (রাঃ) তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, ভাল উদ্দেশে আসিয়া থাকিলে ভাল হইবে, নতুবা তাহার তরবারি দ্বারাই তাহার শিরশ্ছেদ করা হইবে। দরজা খোলা হইলে ওমর ভিতরে পা রাখিতেই নবীজী মোস্তফা (সঃ) নিজেই অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং গায়ে হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উদ্দেশে আসিয়াছ ওমর? অতি মোলায়েম সুরে উত্তর করিলেন, ঈমান লাভের উদ্দেশে।

এই উত্তর শুনার সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবেগে নবীজীর মুখে "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি আসিয়া গেল। উপস্থিত ছাহাবীগণও সজোরে "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দিয়া উঠিলেন; এলাকাস্থ পর্বতমালা গুঞ্জরিয়া উঠিল। এখন তিনি ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু; তখন তাঁহার বয়স ছিল ত্রিশের উর্ধ্বে। (সীরাতুন নবী)

ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ভগ্নীপতি সায়ীদ (রাঃ) আশারা মোবাশ্‌শারাহ তথা রসূল্লাহ (সঃ) কর্তৃক বেহেশতের আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপ্রাপ্ত দশ জন ছাহাবীর একজন। তিনি ইসলাম পূর্ব একত্ববাদী যায়েদের পুত্র (যায়েদের একত্ববাদ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা হইয়াছে), তিনি ওমরের চাচাত ভাইও ছিলেন। তিনি নিজের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন–

১৬৮৪। হাদীছ ঃ সায়ীদ (রাঃ) একদা কুফার মসজিদে বলিতেছিলেন, আমার এই অবস্থাও আমি দেখিয়াছি যে, ইসলাম গ্রহণের অপরাধে ওমর আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন; তখনও ওমর মুসলমান হন নাই। (পৃষ্ঠা– ৫৪৫)

ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণে ইসলাম ও মুসলমানদের নবশক্তির সূচনা হইল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে , একদা নবী (সঃ) দোয়া করিয়াছিলেন–

اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ الْاِسْلَامَ بِاَبِىْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ اَوْ بِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! ইসলামকে শক্তিশালী কর আবু জাহল বা ওমর দ্বারা।" পরবর্তী দিনের প্রথম দিকেই ওমর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তখন হইতে মুসলমানগণ হরম শরীফের মসজিদে প্রকাশ্যে নামায পড়িতে পারিলেন। (মেশকাত শরীফ– ৫৫৭)

নবী (সঃ) প্রথমে দুই জনের মধ্যে অনির্দিষ্টভাবে কোন একজনের ইসলাম প্রার্থনা করিয়াছিলেন; পরে বিশেষভাবে ওমরের নাম নির্দিষ্ট করিয়া পুনঃ দোয়া করিলেন–

اَللّٰهُمَّ اَيِّدِ الْاِسْلَامَ بِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! খাত্তাব পুত্র ওমর দ্বারাই ইসলামের সাহায্য কর।" (সীরাতে মোস্তফা)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দোয়া বাস্তবায়িত হইল; ওমর (রাঃ) মুসলমান হইলেন এবং তাঁহার ইসলাম গ্রহণে মুসলমানদের নবযুগের সূচনা হইল!

১৬৮৫। হাদীছ ঃ (ষষ্ঠ নম্বরের মুসলমান) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, ওমর (রাঃ) মুসলমান হওয়ার পর হইতে আমরা শক্তিলাভ করিয়াছিলাম। (পৃষ্ঠা– ৫৪৫)

ব্যাখ্যা ঃ কাফেরদের বাধাদানে মুসলমানগণ হরম শরীফের মসজিদে নামায পড়িতে পারিতেন না; পাহাড়-পর্বতের আড়ালে লুকাইয়া নামায পড়া হইত। ওমর (রাঃ) মুসলমান হইয়া রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! কাফেরগণ গর্হিত মূর্তিপূজা প্রকাশ্যে করিবে আর আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার এবাদত পলাইয়া পলাইয়া করিব? এরূপ হইতে পারে না। আল্লাহ তাআলার এবাদত প্রকাশ্যে আদায় হওয়া চাই। তখন হইতে হরম শরীফের মসজিদে মুসলমানগণ প্রকাশ্যে নামায আদায় আরম্ভ করিয়া ছিলেন। (আসাহ্হুস সিয়ার– ৯২)

প্রথমে ওমর (রাঃ) এবং হামযা (রাঃ) নবীজী (সঃ)-কে সঙ্গে নিয়া কা'বা শরীফের দিকে অগ্রসর হইলেন; তাঁহারা দুইজন নবীজীর দেহরক্ষীরূপে অগ্রভাগে চলিলেন। কা'বা শরীফের তওয়াফ এবং দুপুর বেলার নামায নির্বিঘ্নে আদায় করিয়া আসিলেন। (বেদায়া ৩/৩১)

তারপর ওমর (রাঃ) সংগ্রামের মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য কা'বা শরীফর সম্মুখে হরম শরীফে নামায পড়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং মক্কাস্থিত সমস্ত মুসলমান সমভিব্যাহারে তথায় নামায আদায় করিয়া যাইতে লাগিলেন। কাফেররা ইহাতে বাধা দিবে সেই সাহস আর তাহাদের হইল না। (বেদায়া ৩–৭৯)

এতদ্ভিন্ন এতদিন ত আরকাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর রুদ্ধগৃহে লুকাইয়া নবী (সঃ) এবং মুসলমানগণ একত্রিত হইতেন; ওমর (রাঃ) মুসলমান হওয়ার পর যেকোন স্থানে ইচ্ছা করিলে নবী (সঃ) এবং মুসলমানগণ একত্রিত হইতে পারিতেন। (সীরাতে মোস্তফা, ১–১২৬)

ইতিপূর্বে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিলে সে যথাসাধ্য ইসলাম লুকাইয়া রাখায় সচেষ্ট হইত, কিন্তু ওমর (রাঃ) মুসলমান হইয়া সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র তাঁহার ইসলাম প্রকাশ করিয়া বেড়াইলেন। এমনকি ইসলাম পূর্বে তিনি যথায় তথায় উঠা-বসা করিতেন, যাহাদের সঙ্গে মেলামেশা করিতেন ঐরূপ সকল স্থানে এবং সকলের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রচার করিলেন। (বেদায়া ৩–৩১)

ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়া চিন্তা করিলাম, মক্কায় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সর্বাধিক কঠিন শত্রু কে আছে– তাহাকেই আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ প্রথমে পৌঁছাইব। তখন আবু জাহলের নাম আমার মনে পড়িল। আমি ভোর বেলা তাহার বাড়ী উপস্থিত হইলাম।

সে আমাকে অতিশয় সমাদর দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই সময় তোমার আগমন কি উদ্দেশে? আমি বলিলাম, তোমাকে এই সংবাদ পৌঁছাইবার জন্য যে, আমি মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি। ইহা শুনিতেই সে গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

(ইবনে হেশাম)

মোশরেকদের তরফ হইতে প্রথম প্রথম আক্রোশের বিভিন্ন ঘটনাবলীর সম্মুখীন তিনি হইতেছিলেন বটে, কিন্তু আল্লাহর রহমতে সাহস এবং সংগ্রাম ও স্থিতিশীলতার দ্বারা সর্বত্র প্রাবল্য প্রতিষ্ঠায় তিনি কৃতকার্য হইতে পারিলেন।

১৬৮৬। হাদীছ ঃ ওমর পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) মুসলমান হইয়াছেন এই সংবাদে মক্কায় বিশেষ চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। অসংখ্য মানুষ আসিয়া ওমরের বাড়ী ঘেরাও করিল; আমি আমাদের গৃহছাদে উঠিয়া সব ঘটনা দেখিতেছিলাম। ওমর (রাঃ) উত্তেজনার মুখে সন্ত্রস্ত হইয়া ঘরে বসিয়া ছিলেন; এমন সময় রেশমের জুব্বা পরিহিত একজন লোক ঘরের ভিতরে আসিয়া ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার? তিনি বলিলেন, তোমার জাতির লোকেরা বলিতেছে, আমি মুসলমান হওয়ার অপরাধে আমাকে মারিয়া ফেলিবে। ঐ লোকটি বলিলেন, একটি মানুষও আপনার নিকট আসিতে পারিবে না। ঐ লোকটি ছিলেন আমাদের মিত্র গোত্র বনু সাহমের সর্দার। তৎকালীন প্রথানুযায়ী এই শ্রেণীর সর্দারের এইরূপ কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইত; সুতরাং উপস্থিত উত্তেজনার মুখে তাঁহার এই কথায় আমরা আশ্বস্ত হইলাম।

অতপর ঐ সর্দার বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সমগ্র প্রান্তর জুড়িয়া দলে দলে মানুষ ভিড় করিয়া আসিতেছে। তিনি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথায় যাইতেছ? তাহারা বলিল, ওমরের বাড়ির দিকে যাইতেছি; সে নাকি ধর্মত্যাগী হইয়া গিয়াছে। ঐ সর্দার ব্যক্তি বলিলেন, তাহাতে কি হইয়াছে। আমি তাঁহার আশ্রয়দাতা সহায়ক। তখন আমি গৃহ ছাদ হইতে দেখিলাম, সমস্ত লোক তথা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া গেল। (পৃষ্ঠা- ৫৪৫)

নবুয়তের সপ্তম বৎসর– হযরতের বিরুদ্ধে মোশরেকদের বয়কট আন্দোলন (পৃষ্ঠা–৫৪৮)

নবুয়তের ষষ্ঠ বৎসরের শেষাংশে পর পর তিনটি ঘটনার দ্বারা মুসলমানদের শুভ লক্ষণের সূচনা হইল, মুসলমানদের সুদিনের সূর্য যেন উদয়ের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল– (১) আবিসিনিয়া হইতে মোশরেকদের প্রতিনিধি দলের সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও অপদস্থরূপে ফিরিয়া আসা এবং তথায় মুসলমানদের অধিক সুযোগ-সুবিধা ও সুখ-শান্তি লাভ। (২) শেরে খোদা হামযা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণ। (৩) সারা মক্কার সুপ্রসিদ্ধ লৌহ মানব ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণ; যাঁহার প্রভাবে মুসলমানগণ প্রকাশ্যে ইসলামের আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, হরম শরীফে নামায পড়িতে সাহসী হইয়াছেন। এইসব কারণে সাধারণভাবে মুসলমানদের অন্তরে শক্তি-সাহসের সঞ্চার হইল এবং বিভিন্ন গোত্রে ইসলামের প্রসার আরম্ভ হইল।

এইসব দেখিয়া মক্কার মোশরেকদের গাত্রদাহ চরমে পৌঁছিয়া গেল, তাহাদের চোখে যেন বর্শাঘাত লাগিল। এই অবস্থা বরদাশত করিতে না পারিয়া এই বার তাহারা হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রাণে বধ করিয়া সর্বদার জন্য নিশ্চিন্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত অধিক দৃঢ়তা ও তৎপরতার সহিত গ্রহণ করিল।

আবু তালেব এই সংবাদ জানিতে পারিয়া বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেব গোত্রীয় সকলকে একত্র করিয়া এই পরিস্থিতিতে হযরত (সঃ)-কে হেফাযত করার আহ্বান জানাইলেন। তাহারা সকলে আবু তালেবের

আহ্বানে সাড়া দিল; যদিও তাহারা কাফের ছিল; কিন্তু "স্বজনকে রক্ষা করার" আরবের রীতি অনুযায়ী এবং আবু তালেবের প্রতি তাহাদের পূর্ণ সমর্থন বিদ্যমান থাকায় তাহারা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত তাঁহার আহ্বানে সম্মতি প্রদান করিল। এমনকি তাহারা হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে "শেবে আবু তালেব" নামক স্থানে (মক্কা নগরীর পর্বত বেষ্টিত একটি ভূখণ্ড, যে স্থানের মহল্লায় আবু তালেবের বসবাস এবং আধিপত্য ছিল, সেই মহল্লায়) নিয়া আসিল এবং বনু হাশেম ও বনু মোত্তালেব অমুসলমান মুসলমান সকলেই তথায় একত্রিতভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া নিল। যেন সর্বদা হযরত (সঃ)-কে তাহারা চোখের উপর রাখিয়া হেফাযত করিতে পারে এবং সকলে একতাবদ্ধরূপে সম্ভাব্য সব রকম আপদ-বিপদের প্রতিরোধ করিতে পারে।

মক্কার মোশরেকগণ অবস্থা দৃষ্টে যখন বুঝিতে পারিল যে, হযরত (সঃ)-কে বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেব গোত্রদ্বয়ের কারণে কোন কিছু করা সম্ভব হইবে না, তখন হযরত (সঃ)-সহ বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেব গোত্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে বয়কট চালাইয়া যাওয়ার এবং একঘরে করিয়া রাখার উপর মক্কা নগরী ও তাহার আশে-পাশের কোরায়শ বংশীয় সমুদয় গোত্র এবং অন্যান্য যেসব গোত্র তাহাদের মিত্র ছিল সকলে শপথ বা হলফ করিল। তৎকালে মক্কা নগরীতে বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেব ছাড়া কোরায়শ বংশীয় অন্ততঃ নয়টি গোত্র ছিল– (১) বনী আবদে শাম্‌স বা বনী উমাইয়া (২) বনী নওফেল, (৩) বনী আবদিদ দার, (৪) বনী আসাদ, (৫) বনী তাইম, (৬) বনী আ'দী, (৭) বনী জুমাহ, (৯) বনী সাহম।

(আরজুল কোরআন, ২–৯৮)

এতদ্ভিন্ন কোরায়শ বংশ ছাড়া তাহাদের দুই পুরুষ পূর্বের "কেনানা" হইতেও কতিপয় গোত্র তথায় ছিল। কোরায়েশ ও কেনানা বংশের সকল গোত্রের লোকগণ "খায়ফে বনী কেনানা বা "মোহাস্‌সাব" নামক স্থানে একত্রিত হইয়া আনুষ্ঠানিকরূপে শপথ করিল যে, বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবের সঙ্গে লেন-দেন আদান-প্রদান, কেনা-বেচা, বিবাহ-শাদী ইত্যাদি কোন প্রকার আচার-অনুষ্ঠান করা চলিবে না যাবত না তাহারা মুহাম্মদ (সঃ)-কে আমাদের হাতে ছাড়িয়া দেয়। এই সম্পর্কে ২য় খণ্ডে ৯০৫ নং হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

এই শপথ লিপিবদ্ধ করতঃ তাহারা কা'বা ঘরে লটকাইয়া দিল। মনে হয় যেন কা'বা গৃহে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর-দেবতাকে তাহারা এই শপথের সাক্ষী বানাইতেছিল এবং শপথনামা তাহাদেরই তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিল। অবস্থাদৃষ্টে বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবগণ তাহাদের সর্দার আবু তালেবের নিকট একত্রিত হইল সমবেতভাবে এই বিপদ মোকাবিলা এবং সম্ভাব্য সকল প্রকার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সর্বদা প্রস্তুতরূপে সকলে শেবে আবু তালেবের গিরি প্রান্তরে একত্র বসবাসের ব্যবস্থা করিল। তাহাদের প্রতিজ্ঞা ও বজ্র কঠিন শপথ ইহাই ছিল যে, হযরত (সঃ)-কে কোন মূল্যেই শত্রুর হস্তে অর্পণ করিবে না। বরং হযরত (সঃ)-কে চোখের উপর রাখার উদ্দেশে তাঁহাকেও ঐ গিরি-প্রান্তরে নিয়া আসিল। নবুয়তের সপ্তম বৎসর মহররম মাসে এই ঘটনা ঘটিল।*

হঠাৎ এই ঘটনা ঘটিবে তাহা কাহারও জানা ছিল না। কাজেই খাদ্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু-সামগ্রী তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করার সময় পান নাই। যাহার নিকট যাহা কিছু ছিল তাহাই লইয়া তাঁহারা ঐ গিরি-প্রান্তরে প্রস্থান করিলেন। এই অবস্থায় বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেব নিদারুণ খাদ্যাভাবসহ অনেক রকম সঙ্কটেরই সম্মুখীন হইলেন। গাছের পাতা ভক্ষণ এবং শুষ্ক চামড়া সিদ্ধ পানি পান করত এই নিদারুণ কষ্টের মোকাবিলা তাঁহারা করিতে লাগিলেন, তবুও কিন্তু তাঁহারা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে শত্রুদের হস্তে অর্পণ করতঃ তাহাদের দাবী পূরণ করিয়া তাহাদের সঙ্গে মীমাংসা করিতে রাজি হইলেন না।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এইভাবে তাঁহাদের অতিবাহিত হইতে লাগিল। মক্কাবাসীরা তাঁহাদের উপর হাট ঘাট এমনভাবে বন্ধ করিয়াছে যে, বাহির হইতে কোন কিছু সংগ্রহ করাও তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব

* তাবাকাতে ইবনে সা'দ ১–২০৯ এবং যোরকানী ১–২৭৮।